ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

নির্বাচিত ফাতাওয়া

[Bengali - বাংলা - بنغالي]

মিরফাত বিনতে কামিল আবদিল্লাহ উসরা

৪০৩২

অনুবাদ:মোঃ আমিনুল ইসলাম

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

فتاوى مختارة للطلاب والطالبات

مرفت بنت كامل عبد الله أسرة

ജ്ഞ

ترجمة: محمد أمين الإسلام

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣﴾ [النحل: ٤٣]

“তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ পুরুষই প্রেরণ করেছিলাম; তোমরা যদি না জান, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৪৩]

সূচীপত্র

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আমাদের নফসের জন্য ক্ষতিকর এমন সকল খারাপি এবং আমাদের সকল প্রকার মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আর যাকে তিনি পথহারা করেন, তাকে পথ প্রদর্শনকারীও কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ [ال عمران: ١٠٢]

“হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোনো অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করো না।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০২]

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾ [النساء: ١]

“হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবী কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾ [الاحزاب: ٧٠، ٧١]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭০, ৭১]

অতঃপর:

মুসলিম পুরুষ ও নারীর জীবনে এমন অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়, যে ব্যাপারে শরী‘আতের বিধান জানা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

আর জ্ঞানীদের নিকট প্রশ্ন করা এবং তাদের নিকট ফাতওয়া জানতে চাওয়াটা জ্ঞান অর্জনের অন্যতম চাবিকাঠি। কেননা জাবির রাদিয়াল্লাহু

'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«... أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ...».

"...তারা যখন জানে না, তখন তারা কেন প্রশ্ন করলো না? কারণ, অজ্ঞতার চিকিৎসা হলো প্রশ্ন করা..."[১] এখান থেকেই এই সিরিজের চিন্তা আসে- 'অজ্ঞতা নিরাময় সিরিজ'; যার পিছনে আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো সম্মানিত আলেম ও শাইখগণের নির্ভরযোগ্য ফাতওয়াসমূহ থেকে একটি সহজ সংকলন তৈরি করা, যা সমাজের বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তার মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের দলটি সমাজের মধ্যে একটি বড় অংশ হওয়ার কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট শর'ঈ ফাতওয়া সম্পর্কে অনেকেরই জানা প্রয়োজন।

আর এসব পৃষ্ঠার মধ্যে আমি ঐসব ফাতওয়া থেকে বাছাইকৃত অংশ সংকলন করেছি এবং সেগুলোর উৎস ও তথ্যসূত্রের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছি।

---

[1] ইমাম আবূ দাউদ রহ. জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে (১/২৩৯) এই হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন, পবিত্রতার অধ্যায় (كتاب الطهارة), পরিচ্ছেদ: আহত ব্যক্তি তায়াম্মুম করবে (باب فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ), হাদীস নং ৩৩৬, আলবানী 'সহীহুল জামে' (صحيح الجامع)-এর মধ্যে (৪/১৩১) হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন, হাদীস নং ৪২৩৮।
আর العِيّ শব্দের অর্থ: মূর্খতা। -ইবনুল আসীর, 'আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আসার' (النهاية في غريب الحديث والأثر), ৩/৩৩৪, মূলবর্ণ عيا

অতঃপর আমি যদি এই সঠিক কিছু করে থাকি, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে, যিনি একক, যার কোনো শরীক নেই, আমি তাঁর প্রশংসা করছি; এমন প্রশংসা যা তাঁর মহান মর্যাদা ও ক্ষমতার সাথে মানানসই, তিনি পবিত্র ও মহান। আর আমি তাঁর নিকট প্রার্থনা করছি, যাতে তিনি এই কাজটিকে একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য সঠিক ও নির্ভেজাল আমল হিসেবে গণ্য করেন।

আর আমি যদি ভুল করে থাকি, তবে তা একান্ত আমার নিজের ও শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে; আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা ও মার্জনা প্রার্থনা করছি।

و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

"আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর"।

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

"আর আমাদের শেষ দো'আ হবে: 'সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর প্রাপ্য"।

নিয়তের মধ্যে সনদ লাভের ইচ্ছা কি নিন্দনীয় হবে?

প্রশ্ন: শর‘ঈ জ্ঞান অর্জনকারী কোনো কোনো ছাত্র তাদের জ্ঞান অর্জন ও সনদ (সার্টিফিকেট) লাভের নিয়তের বিষয়টি নিয়ে বিব্রত বোধ করে, সুতরাং এই বিব্রত অবস্থা থেকে ছাত্রগণ কীভাবে মুক্তি লাভ করবে?

উত্তর: এর উত্তর দেওয়া হয় কয়েকভাবে:

প্রথমত: মৌলিকভাবে এই সনদ (সার্টিফিকেট) লাভ করাটাই তাদের উদ্দেশ্য হবে না; বরং মানব জাতির সেবার ময়দানে কাজ করার উপায় হিসেবে এই সনদকে গ্রহণ করবে। কারণ, বর্তমান সময়ে কাজকর্ম সনদের ওপর নির্ভরশীল এবং মানুষ এই উপায় অবলম্বন করা ব্যতীত সৃষ্টির উপকারের দোরগোড়ায় পৌঁছুতে সক্ষম হবে না, আর এই পদ্ধতিতে নিয়ত বিশুদ্ধ হবে।

দ্বিতীয়ত: যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে চাইবে, সেই ব্যক্তি এসব স্কুল ও কলেজ ব্যতীত অন্য কোথাও তা অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং সে তাতে জ্ঞান অর্জনের নিয়তে ভর্তি হবে এবং তার ওপর সনদ বা সার্টিফিকেটের মত কোনো বিষয়ের প্রভাব পড়বে না, যা পরবর্তী সময়ে সে অর্জন করবে।

তৃতীয়ত: মানুষ যখন তার কর্মের মাধ্যমে দু’টি কল্যাণ লাভের ইচ্ছা পোষণ করবে, একটি দুনিয়ার কল্যাণ এবং অপরটি আখিরাতের কল্যাণ, তখন এই ক্ষেত্রে তার কোনো অপরাধ হবে না ।কারণ, আল্লাহ বলেন, ﴿... وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ ...﴾ [الطلاق: ٢، ٣]

“...আর যে কেউ আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ বের করে দেবেন এবং তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন...।” [সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ২, ৩) এখানে দুনিয়া সংক্রান্ত উপকারিতা উল্লেখের মাধ্যমে তাকওয়ার গুণ অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয়: যে ব্যক্তি তার কর্মের মাধ্যমে দুনিয়া লাভের ইচ্ছা পোষণ করবে, তাহলে কীভাবে তাকে মুখলিস বা একনিষ্ঠ বলা হবে?

উত্তরে আমি বলব: সে তার ইবাদতের উদ্দেশ্যকে নির্ভেজাল ও একনিষ্ঠ করেছে এবং এর দ্বারা কোনো সৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করে নি। ইবাদতের দ্বারা মানুষকে দেখানো বা মানুষের প্রশংসা অর্জন করার উদ্দেশ্যও করে নি। তবে সে ইবাদতের একটি পার্থিব ফলাফল উদ্দেশ্য করেছে। তাই সে ঐ লোক-দেখানো আমলকারী ব্যক্তির মতো নয়, যে এমন কিছু আমল দ্বারা মানুষের নিকটবর্তী হয়, যা দ্বারা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার কথা এবং যে এর দ্বারা মানুষের প্রশংসা অর্জন করতে চায়।

কিন্তু এই দুনিয়াবী উদ্দেশ্যের ফলে তার ইখলাসে কমতি হবে; এতে করে সে এক ধরনের শির্কে পতিত হবে এবং তার মর্যাদা ঐ ব্যক্তির নীচে চলে যাবে, যিনি আমল দ্বারা আখিরাতকেই একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।

আর এই প্রসঙ্গে আমি কিছু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যারা ইবাদতের উপকারিতার ব্যাপারে কথা বলার সময় একে পুরোপুরি দুনিয়াবী উপকারিতায় রূপান্তরিত করে। উদাহরণস্বরূপ তারা বলে:

'সালাতের মধ্যে শরীরচর্চা ও স্নায়ুর জন্য উপকার রয়েছে'; 'সাওমের (রোযার) মধ্যে ফায়দা হলো: এর কারণে শরীরের মেদ কমে এবং খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম-শৃঙ্খলা অর্জিত হয়'। অথচ এই শুধু দুনিয়াবী উপকারিতা বর্ণনা করাই প্রধান আলোচ্য বিষয় করা উচিৎ নয়। কারণ, তা ইখলাসকে দুর্বল করে দেয় এবং আখেরাতকে চাওয়া থেকে মানুষকে অমনোযোগী করে। আর এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের মধ্যে সাওমের তাৎপর্য সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, সাওম হচ্ছে তাকওয়া অর্জনের অন্যতম উপায়। সুতরাং দীনী উপকারিতাই হলো মুখ্য, আর দুনিয়াবী (পার্থিব) উপকারিতা গৌণ। আর যখনই আমরা সাধারণ জনগণের নিকট কথা বলব, তখন আমরা দীনী দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের নিকট আলোচনা পেশ করব, আর যখন আমরা এমন ব্যক্তির নিকট কথা বলব, যে ব্যক্তি বস্তুগত ফায়দা ছাড়া পরিতৃপ্ত হবে না, তার নিকট আমরা দীনী ও দুনিয়াবী উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা পেশ করব। আর স্থান, কাল ও পাত্রভেদেই কথা বলতে হয়।

শাইখ ইবন 'উসাইমীন

ফাতওয়ায়ে আকিদা (فتاوى العقيدة): পৃ. ২০২

বর্তমান সময়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

প্রশ্ন: বর্তমানে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ, মাদরাসা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করছি, আর এত সব প্রতিষ্ঠানের ছড়াছড়ি সত্ত্বেও এগুলো ঐসব বিজ্ঞ আলেমদের মত আলেম তৈরি করতে সমর্থ হয় নি যেসব আলেম পূর্ববর্তী সময়ে মসজিদসমূহে অবস্থিত শিক্ষার আসর থেকে তৈরি হয়েছেন; চাই এই সামর্থ্য জ্ঞানগত দিক থেকে হউক অথবা ফিকহ শাস্ত্রের ব্যাপারে হউক ...; অথবা সেই সামর্থ্য কথোপকথন ও বিতর্কের ক্ষেত্রে হউক ... সুতরাং এ ক্ষেত্রে কারণগুলো কী কী?

উত্তর: কোনো সন্দেহ নেই যে, পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে বর্তমান সময়ের ইলম বা জ্ঞানের মান কম। তবে আমরা ঢালাওভাবে সকল মানুষের ব্যাপারে বলি না যে, তাদের জ্ঞানগত মান (standard) দুর্বল। কারণ, আল্লাহর শুকরিয়া (আলহামদুলিল্লাহ) এখনও অনেক মানুষ পাওয়া যাচ্ছে, যারা তাঁদের জ্ঞানে ও কর্মে শ্রেষ্ঠ; তবে বর্তমান সময়ে শিক্ষার দুর্বলতার বিষয়ে আমার অভিমত হলো, এটা শিক্ষার দুর্বলতা নয়, কেননা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বেকার সময়ের শিক্ষাপদ্ধতির মতই। সুতরাং বর্তমান সিলেবাসটি (কারিকুলাম) অবিকল আগের সিলেবাসটিই; কিন্তু আমার দৃষ্টিতে শুধু পাঠ করাই সব কিছু নয়...। কারণ, পাঠ করা হচ্ছে জ্ঞানের চাবিকাঠি ও দরজা মাত্র ..., আর পূর্বের আলেমগণ তাদের পুরো জীবনটাই অতিবাহিত হয়েছে পঠন—পাঠন ও অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে, তারা শ্রেণীকক্ষে বা শিক্ষার আসরে যে শিক্ষা গ্রহণ করতেন, তার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকতেন না; বরং তারা অধ্যয়ন ও আলোচনা-পর্যালোচনা সার্বক্ষণিক অব্যাহত রাখতেন।

আর স্বতঃসিদ্ধ কথা হলো, আলোচনা ও অধ্যয়নের মাধ্যমেই জ্ঞান বৃদ্ধি পায়; অপরদিকে বর্তমানে যে বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে, তা হলো অধিকাংশ শিক্ষার্থী উঁচু রেঙ্ক ও উন্নত মানের ফলাফল অর্জন করে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিতাব ও জ্ঞানের সাথে তাদের নেই কোনো সম্পর্ক।

বস্তুত: এ পদ্ধতিতে জানা-বিষয়াদির মৃত্যু ঘটে। কারণ, বিদ্যা হচ্ছে চারাগাছের মতো, যখন তুমি তার পরিচর্যা করবে, তখন তা বড় হবে এবং ফল দেবে, আর যদি তুমি তার যত্ন না নাও, তবে তার পরিণতি হলো মৃত্যু এবং ধ্বংস..., আর আমলের দিক বিচারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আলেমগণ ছিলেন সৎকর্মশীল আলেম এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি একনিষ্ঠ, যারা আল্লাহকে ভয় করতেন। আর এই গুণটি আমাদের এই যুগের শিক্ষার্থীদের মাঝে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। সব মানুষের ব্যাপারে খারাপ ধারণা না পোষণ করেও বলা যায় যে, খুব অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীই রয়েছে যারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে। অথচ একমাত্র আমলই ইলম (জ্ঞান) কে পরিশুদ্ধ ও পরিবর্ধণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ ﴾ [فاطر: ٢٨]

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তারাই কেবল তাঁকে ভয় করে।" [সূরা ফাতির, আয়াত: ২৮] সুতরাং আলেমগণ হলেন আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ। সালাফে সালেহীনদের কেউ কেউ বলেন, ইলম দুই প্রকার: এক প্রকার হলো ভাষাগত বা মৌখিক ইলম, আর এটা আল্লাহর বান্দাদের ওপর তাঁর দলীল-প্রমাণাদি, আর অপর প্রকার হলো আন্তরিক

ইলম, আর এটাই হলো বিশুদ্ধ জ্ঞান, যে জ্ঞান আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ভয়কে বৃদ্ধি করে, আর তারা এই আয়াতটির দ্বারা দলীল পেশ করেছেন:

﴿ إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ ﴾ [فاطر: ٢٨]

“আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তারাই কেবল তাঁকে ভয় করে।” [সূরা ফাতির, আয়াত: ২৮]

শাইখ আল-ফাওযান

ফাতওয়া (فتاوى): ২/১৩৫ (ঈষৎ পরিবর্তিত)

পরীক্ষার জন্য আল-কুরআন মুখস্থ করা

প্রশ্ন: এমন ব্যক্তির বিধান কী হবে, যে বেশি বেশি কুরআন পাঠ করে, কিন্তু তার স্মরণ শক্তির দুর্বলতার কারণে তা মুখস্থ করতে সমর্থ হয় না? আর ঐ ব্যক্তির বিধান কী হবে, যে আল-কুরআন মুখস্থ করে এবং তা ভুলে যায় ঐ ব্যক্তির মতো, যে তা পরীক্ষার জন্য মুখস্থ করে, এতে কি তার গুনাহ হবে?

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على رسوله و آله و صحبه.

(সকল প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীগনের প্রতি)।

অতঃপর........

উত্তর: যে ব্যক্তি বেশি বেশি কুরআন পাঠ করে, কিন্তু তার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে সে তা মুখস্থ করতে পারে না, তবে সে ব্যক্তিকে তার পাঠ করার ওপর সাওয়াব দেওয়া হবে এবং তার মুখস্থ না হওয়ার ক্ষেত্রে তার ওযর গ্রহণ করা হবে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ ﴾ [التغابن: ١٦]

“সুতরাং তোমরা সাধ্যমত আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।” [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬], আর যে ব্যক্তি উদাহরণস্বরূপ পরীক্ষার জন্য আল-কুরআন মুখস্থ করে, অতঃপর তা ভুলে যায়, তবে সে গুনাহগার হবে এবং সে অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। আর তাওফীক দানের মালিক আল্লাহ।

و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

(আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের ওপর)।

গবেষণাপত্র ও ফাতওয়া বিষয়ক স্থায়ী পরিষদ

সভাপতি	সহ-সভাপতি
আবদুল আযীয ইবন ইবন বায	আবদুর রাজ্জাক 'আফীফী
সদস্য	সদস্য
আবদুল্লাহ ইবন গুদাইয়ান	আবদুল্লাহ ইবন কু'ঊদ

স্থায়ী পরিষদের ফাতাওয়া (فتاوى اللجنة الدائمة): ৪/৬৩, ফাতাওয়া নং-৭৭৩১

শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা

প্রশ্ন: শিক্ষার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো ছাত্রের জন্য কিছু কিছু প্রাণীর ছবি অঙ্কন করার প্রয়োজন হয়, সুতরাং এর বিধান কী হবে?

উত্তর: এসব প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা বৈধ নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছবি অঙ্কনকারীদেরকে অভিশাপ (লানত) দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

«إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون»

“কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে মানুষের মধ্য কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে ছবি অঙ্কনকারীগণ।”[2] আর এটা প্রমাণ করে যে, ছবি অঙ্কন করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, কবীরা গুনাহ ব্যতীত লা‘নতের (অভিশাপের) বিষয়টি আসে না এবং কবীরা গুনাহের প্রসঙ্গ ছাড়া কঠিন শাস্তির হুমকিও প্রদান করা হয় না; কিন্তু শরীরের হাত, পা ও অনুরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছবি অঙ্কন বৈধ। কারণ, এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রাণ অবস্থান করে না; হাদীসের বক্তব্যসমূহের বাহ্যিক দিক হলো, ঐ ছবি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অঙ্কন করা হারাম, যার মাঝে প্রাণ বা জীবনের অবস্থান সম্ভব। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ»

“যে ব্যক্তি ছবি তৈরি করে, তাকে কিয়ামতের দিন তাতে জীবন দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে, কিন্তু সে সক্ষম হবে না।”[3]

---

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬০৬

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬০৬

শাইখ ইবন 'উসাইমীন

মাজমু'উ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল (مجموع فتاوى و رسائل): ২/২৭২

জরুরি প্রয়োজনে ছবি অঙ্কন করা

প্রশ্ন: সম্মানিত শাইখ ইবন 'উসাইমীন রহ.-কে প্রশ্ন করা হয়েছে, আপনি পূর্বের এক ফাতওয়ায় বলেছেন: "যখন ছাত্র পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং তার জন্য ভিন্ন কোনো উপায় থাকবে না, তখন সে যেন মাথা বিহীন প্রাণীর ছবি অঙ্কন করে"; কিন্তু যখন ছাত্র মাথা অঙ্কন করবে না, তখন সে পরীক্ষায় ফেল করবে- এমতাবস্থায় সে কী করবে?

উত্তর: অবস্থা যখন এই, তখন ছাত্র এই কাজে বাধ্য ও নিরুপায়, আর গুনাহ হবে ঐ ব্যক্তির, যে ব্যক্তি তাকে নির্দেশ দিয়েছে এবং এই কাজে তাকে বাধ্য করেছে। কিন্তু আমি কর্তৃপক্ষের নিকট আশা করবো, তারা যেন তাদের নির্দেশকে এই সীমানা পর্যন্ত নিয়ে না যায়, যার কারণে আল্লাহর বান্দাগণ আল্লাহর অবাধ্য হতে বাধ্য হয়।

শাইখ ইবন 'উসাইমীন

মাজমু'উ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল (مجموع فتاوى و رسائل): ২/২৭৪ (ঈষৎ পরিবর্তিত)

ছবির আকৃতি ও ঘাড়ের মাঝে দাগ দেওয়া

প্রশ্ন: বইপত্রে যে সব ছবি রয়েছে সেসব ছবি মুছে ফেলা আবশ্যক হবে কি? আর ছবিতে ঘাড় ও দেহের মধ্যে দাগ দেওয়ার কারণে হারাম হওয়ার বিষয়টি দূর হবে কি?

উত্তর: ছবি মুছে ফেলাটাকে আমি আবশ্যক মনে করি না। কারণ, এতে বড় ধরনের কষ্টের কাজ; তাছাড়া আরও একটি কারণ হচ্ছে, এসব বইপত্র দ্বারা এসব ছবিই উদ্দেশ্য নয়, বরং তাতে যা আছে, তার মূল উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষা।

আর ছবিতে ঘাড় ও দেহের মধ্যে দাগ দেওয়ার কারণে ছবির আসল আকৃতি বা কাঠামোতে পরিবর্তন হয় না।

শাইখ ইবন 'উসাইমীন

মাজমু'উ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল (مجموع فتاوى و رسائل): ২/২৭৩

চিত্র অঙ্কন ও ভাস্কর্য বানানোর শখ

প্রশ্ন: আমি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রথম বর্ষের ছাত্র। আমি আমার ছোট বেলা থেকেই চিত্রাঙ্কন পছন্দ করতাম, আর আমি ছবি অঙ্কনের কাজে এমনভাবে আকৃষ্ট হয়ে গেছি, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না, আর এখন আমি জানতে পারলাম যে, চিত্রাকঙ্কন আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে; কিন্তু আমি চিত্রাঙ্কনের সাথে অনেক বেশি সক্রিয়ভাবে জড়িত এবং শুধু চিত্রাঙ্কনের সাথেই নয়, বরং আমি ভাস্কর্য বানানোকেও পছন্দ করি; তারপর আমি চিত্রাকঙ্কন ও ভাস্কর্য বানানোর কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি. কিন্তু শয়তান চিত্রাঙ্কনের কাজকে আমার নিকট আকর্ষণীয় করে তুলে। আমি আপনার নিকট আশা করছি যে, আপনি আমাকে এমন একটি পদ্ধতি বা পথের সন্ধান দেবেন, যা অনুসরণ করলে আমি চিত্রাকঙ্কন ও ভাস্কর্য বানানোর কাজ ছেড়ে দিতে পারব?

الحمد لله وحده, و الصلاة و السلام على رسوله و آله و صحبه.

(সকল প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য; সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীগণের প্রতি)।

অতঃপর.......

উত্তর: প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণ করা হারাম। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছবি নির্মাতাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

«إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون»

“কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে মানুষের মধ্যে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে ছবি অঙ্কনকারীগণ।”[4]

আর আমরা তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি তোমার অবসর সময়টিকে বইপুস্তক পাঠ করা অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য ও অনুরূপ কোনো কাজে ব্যয় করবে, যা তোমার মাঝে ও হারাম (অবৈধ) কাজে নিয়োজিত হওয়ার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। আর তাওফীক দানের মালিক আল্লাহ;

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর)।

স্থায়ী পরিষদ, শিক্ষা-গবেষণা ও ফাতাওয়া বিষয়ক

সভাপতি	সহ-সভাপতি
আবদুল আযীয ইবন বায	আবদুর রাজ্জাক ‘আফীফী
সদস্য	সদস্য
আবদুল্লাহ ইবন গুদাইয়ান	আবদুল্লাহ ইবন কু‘ঊদ

স্থায়ী পরিষদের ফাতাওয়া (فتاوى اللجنة الدائمة): ১/৪৭৭, ফাতাওয়া নং-৮০৪১

[4] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬০৬

ছবি সংবলিত ম্যাগাজিন ও সময়িকী সংরক্ষণ

প্রশ্ন: আমি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের একজন ছাত্র; আমার শখ হলো পড়াশুনা ও তথ্য অনুসন্ধান করা, যা আমাকে অনেক ইসলামী, সাংস্কৃতিক ও সামরিক ম্যাগাজিন অধ্যয়নের দিকে ধাবিত করে, কিন্তু এসব ম্যাগাজিনের কিছু কিছু, বরং অধিকাংশের মধ্যেই মানুষের ছবি রয়েছে, অথচ আমি আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে ম্যাগাজিনসমূহ সংরক্ষণ করি এবং এগুলোর মধ্যে ছবিসমূহ বিদ্যমান থাকে, আর চিত্র শিল্পীদের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে এবং যেই ঘরে কুকুর ও ছবি রয়েছে, সেই ঘরে ফিরশতা প্রবেশ না করার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, আমরা হাদীসে নববী থেকে তা জানতে পেরেছি ...। আমি এই মাসআলাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা কামনা করছি, যাতে তার অস্পষ্টতা স্পষ্ট হয় এবং তা পরিপূর্ণ আলোচনা বিশিষ্ট হয়?

উত্তর: উপকারী বইপত্র, পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিন সংরক্ষণে কোনো প্রকার বাধা বা নিষেধ নেই, যদিও তাতে কোনো প্রকার ছবি বিদ্যমান থাকুক; কিন্তু যদি ছবিসমূহ নারীর হয়, তবে তা মুছে দেওয়া বা বিলুপ্ত করা আবশ্যক (ওয়াজিব), আর যদি তা পুরুষের ছবি হয়, তবে এই বিষয়ে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসের ওপর আমল করে ঐ ছবির মাথা বিলুপ্ত বা ঢেকে দিলেই যথেষ্ট হবে।

শাইখ ইবন বায

ফাতাওয়া ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ৪/৩৩২

সফরে ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি উঠানো

প্রশ্ন: আমরা যখন কোনো ছাত্র ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সফরে যাই, তখন শুধু স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা কিছু ছবি সংগ্রহ করি। সুতরাং এই অবস্থায় ছবিগুলোর বিধান কী হবে?

উত্তর: ছবিগুলো যখন প্রাণীর হবে, তখন তা হারাম বলে গণ্য হবে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون»

“কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে মানুষের মধ্যে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে ছবি অঙ্কনকারীগণ।”[5] তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিত্র শিল্পীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন; তবে ছবি যদি প্রাণীর না হয়ে গাড়ী, বিমান, খেজুরগাছ ইত্যাদির মতো হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

আর আল্লাহই হলেন তাওফীক দানের মালিক।

শাইখ ইবন বায

ফাতাওয়া ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ২/২৬০

[5] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬০৬

তাবীয লেখকের জন্য রহমতের দো'আ করা

প্রশ্ন: আমার এক শিক্ষক ছিলেন, যিনি আমাকে আল-কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং আমার মায়ের পিতার নানা, তারা উভয়ে মারা গেছেন; তারা তাবিযের জন্য আল-কুরআনের আয়াত লিখতেন, অতঃপর তা মানুষকে দিতেন। অতঃপর তারা আমাকে নিয়মিত কুরআন অধ্যয়নের নির্দেশ দেন এবং আমিও নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকি, এমনকি শেষ পর্যন্ত আমার রব (প্রতিপালক) আমাকে তাওহীদ তথা একত্ববাদের বুঝ দান করলেন। অতঃপর আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তারা উভয়ে কিছু অশুদ্ধ (ভুল) কাজ করেছেন। সুতরাং আমি কি তাদের জন্য দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারব (و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته) (আপনাদের ওপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক)?

উত্তর: তাবীয হিসেবে ঝুলিয়ে রাখার জন্য আল-কুরআনের আয়াত লিখা বৈধ নয়; অনুরূপভাবে বিশুদ্ধ দলিলের ভিত্তিতে হিফাযত (সংরক্ষিত) রাখা অথবা রোগ নিরাময় অথবা বালা-মুসিবত দূর করার আশায় লিখিত কুরআনের আয়াত ঝুলিয়ে রাখাও বৈধ নয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার জন্য তোমার শিক্ষক ও নানার উদ্দেশ্যে রহমত ও মাগফিরাত (ক্ষমা) কামানা করে দো'আ করা বৈধ, যদিও তারা তাদের জীবদ্দশায় এই কাজ করতেন। কেননা, তা শির্ক নয়, যদিও তা জায়েয (বৈধ) নয়; তবে যদি তুমি তাদের ব্যাপারে এ বিষয় ছাড়া এমন কোনো বিষয় সম্পর্কে জান, যা তাদের কুফুরীকে নিশ্চিত করে। যেমন, মৃত ব্যক্তিকে ডাকা বা তার নিকট প্রার্থনা করা, জিন্নের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি, যা বড়

প্রকারের শির্কের অন্তর্ভুক্ত, তাহলে তুমি তাদের জন্য দো‘আ করবে না এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে না।

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর)।

স্থায়ী পরিষদ, শিক্ষা-গবেষণা ও ফাতওয়া বিষয়ক

সভাপতি	সহ-সভাপতি
আবদুল আযীয ইবন বায	আবদুর রাজ্জাক ‘আফীফী
সদস্য	সদস্য
আবদুল্লাহ ইবন গুদাইয়ান	আবদুল্লাহ ইবন কু‘উদ

স্থায়ী পরিষদের ফাতওয়া (فتاوى اللجنة الدائمة): ১/২০৯, ফাতওয়া নং ৪১৮৪

বিপজ্জনক শব্দের মাধ্যমে কৌতুক করা

প্রশ্ন: কোনো এক তরুণী আল-কুরআনের ‘আমপারা মুখস্থ করার কারণে পুরস্কার লাভ করল এবং তার এক দল বান্ধবীর নিকট গিয়ে হাযির হলো; অতঃপর তাদের একজন তাকে বলল: তুমি কি পুরস্কার লাভ করেছ? তখন সে বলল: দেখানোর জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং অচিরেই তা ত্যাগ করব। অতএব, এই ধরনের কথার হুকুম (বিধান) কী হবে? আর তার ওপর কোনো বিধান প্রযোজ্য হবে, যে ব্যক্তি অনিচ্ছা সত্ত্বেও রসিকতা করে এই কথা বলেছে? জেনে রাখা প্রয়োজন, সে হলে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের একজন ছাত্রী ...?

উত্তর: এই কথা খুবই বিপজ্জনক, কোনো মানুষের জন্য কৌতুক করেও তা উচ্চারণ করা বৈধ নয়। কারণ, এমন কথার মাধ্যমে রসিকতা করা বৈধ নয়। আর যে এমন কথা বলেছে, তার ওপর আবশ্যক হলো, সে আল্লাহর নিকট তাওবা করবে, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং কখনও এই ধরনের নোংরা কথার পুনরাবৃত্তি করবে না। কারণ, হাদীসের মধ্যে এসেছে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب».

“নিশ্চয় ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোনো কথা বলে ফেলে যার পরিণতি সম্পর্কে সে সচেতন নয়, অথচ সেই কথার কারণে সে জাহান্নামে এত নীচে পতিত হবে যার দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার দূরত্বের চেয়ে অনেক বেশি।”

আর আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের ওযর গ্রহণ করেন নি, যখন তারা অনর্থক কথাবার্তা উচ্চারণ করেছে এবং বলেছে,

﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلۡعَبُۚ﴾ [التوبة: ٦٥]

"আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬৫]

শাইখ আল-ফাওযান

ফাতওয়া (فتاوى): **১/৬৮**

ছাত্রদেরকে উৎসাহ প্রদানের জন্য হাততালি দেওয়া

প্রশ্ন: কোনো ব্যক্তির জন্য তার বাচ্চার সাথে হাস্য-রসিকতার ছলে হাততালি দেওয়া অথবা শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের নিকট থেকে অপর এক ছাত্রকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য হাততালি তলব করা বৈধ হবে কি?

উত্তর: এই ধরনের হাততালি উচিৎ নয় এবং তার সর্বনিম্ন অবস্থা হলো তা খুবই অপছন্দনীয়। কারণ, তা হলো জাহেলিয়াতের সময়কালের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, আর তাছাড়া হাততালি সালাতের মধ্যে ভুল হওয়ার সময় নারীগণ কর্তৃক সতর্ক সঙ্কেতও বটে। আর তাওফীক দানের মালিক আল্লাহ।

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর)।

স্থায়ী ফাতওয়া বোর্ড

ফাতাওয়া ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ৪/৩৩২

ঋতুবর্তী ছাত্রীদের কুরআন পাঠ

প্রশ্ন: আমরা মহিলা কলেজের ছাত্রী, আমাদের পাঠ্যসূচীতে আল-কুরআন থেকে অংশবিশেষ মুখস্থ করার বিষয় রয়েছে; কিন্তু কখনও কখনও আমাদের মাসিক অবস্থায় পরীক্ষার নির্দিষ্ট তারিখ হাযির হয়ে যায়, সুতরাং এমতাবস্থায় আমাদের জন্য খাতার মধ্যে কোনো সূরা লেখা এবং তা মুখস্থ করা শুদ্ধ (বৈধ) হবে কিনা?

উত্তর: আলেমদের দু'টি মতের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মতে, হায়েয এবং নিফাসকালীন সময়ে নারীদের জন্য কুরআন পাঠ করা বৈধ। কারণ, এই ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কোনো দলীল সাব্যস্ত নেই; কিন্তু আল-কুরআনের মাসহাফ (গ্রন্থ) স্পর্শ করা ব্যতীত পাঠ করতে হবে, আর উভয় অবস্থায় নারী পবিত্র কাপড় ও অনুরূপ কিছুর সাহায্যে আড়াল করার মাধ্যমে তাকে ধরতে পারবে; অনুরূপভাবে ঐ খাতার ব্যাপারেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে, প্রয়োজনের সময় যার মধ্যে আল-কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়।

তবে যার ওপর অপবিত্রতাজনিত কারণে গোসল ফরয হয়েছে, এমন অপবিত্র ব্যক্তি গোসল না করা পর্যন্ত কুরআন পাঠ করবে না। কারণ, এই ব্যাপারে বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা নিষেধাজ্ঞার ওপর প্রমাণবহ। এই ক্ষেত্রে হায়েয এবং নিফাসকালীন সময়ের নারীদের ওপর অনুমান (কিয়াস) করা বৈধ হবে না। কারণ, অপবিত্রতা জনিত কাজ থেকে অবসর হওয়ার পর থেকে যে কোনো সময়ে তার জন্য গোসল করে পবিত্র হওয়া সহজ। আর আল্লাহই তাওফীক দানের মালিক।

শাইখ ইবন বায। ফাতওয়া (الفتاوى): **১/৩৯**

ঋতুবর্তী ছাত্রীদের আল-কুরআনের মুসহাফ স্পর্শ করা

প্রশ্ন: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করার সময়ে ঋতুবর্তী নারীর পক্ষে কুরআন স্পর্শ করা; বিশেষ করে যখন শিক্ষিকা আমাদেরকে এই কথা বলে বাধ্য করে যে, এটা হারাম নয়, কেননা আমরা তো শিখছি— এই ক্ষেত্রে বিধান কী হবে?

উত্তর: এই মাসআলাটি দু'টি মাসআলাকে শামিল করে:

প্রথম মাসআলা: অযুবিহীন অবস্থায় মুসহাফ স্পর্শ করা। বিজ্ঞ আলেমগণ এই ব্যাপারে মতভেদ করেছেন, তাদের কেউ কেউ বলেন, অযুবিহীন অবস্থায় তা স্পর্শ করা বৈধ। কারণ, কুরআন স্পর্শ করার জন্য পবিত্রতার আবশ্যকতার ওপর বিশুদ্ধ দলীল নেই। আর এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, ঋতুবর্তী নারীর জন্য কুরআন স্পর্শ করা বৈধ। কারণ, কুরআন স্পর্শ করার ক্ষেত্রে পবিত্রতা শর্ত নয়। আর অপর আলেমগণ বলেন, যে ব্যক্তি পবিত্র নয়, তার জন্য কুরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لا يمس القرآن إلا طاهر».

“পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কেউ আল-কুরআন স্পর্শ করবে না।” আর طاهر শব্দের অর্থ অযুভঙ্গের মতো অপবিত্রতা থেকে পবিত্র এবং নাপাকির অপবিত্রতা থেকে পবিত্র। সুতরাং অপবিত্র ব্যক্তির অঙ্গ দ্বারা তা স্পর্শ করবে না।

আর প্রথম পক্ষের আলেমগণ এই দলীল পেশের জবাবে বলেন যে, তার দ্বারা অযু ভঙ্গের মত অপবিত্রতা এবং নাপাকি বা অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা বুঝানোর যেমন সম্ভাবনা রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে তার দ্বারা

শির্ক থেকে পবিত্রতা বুঝানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। কেননা আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إن المؤمن لا ينجس».

“নিশ্চয় মুমিন অপবিত্র হয় না।” তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের প্রসঙ্গে বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ ﴾ [التوبة: ٢٨]

“হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র।” [সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ২৮] আর এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, মুসলিম মাত্রই পবিত্র, সুতরাং তার জন্য কুরআন স্পর্শ করা বৈধ, আর অমুসলিম ব্যক্তি অপবিত্র। সুতরাং তার জন্য মুসহাফ স্পর্শ করা বৈধ নয়। আর যখন কোনো শব্দ দু’টি অর্থের সম্ভাবনা রাখবে, তখন প্রমাণ ব্যতীত সম্ভাব্য দু’টি অর্থের একটি বাদ দিয়ে অপরটি আবশ্যক করা যাবে না। আর এ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধ শব্দ নয় যে এটা অপবিত্র ব্যক্তি ও কাফির উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে এটা বলা যাবে; বরং এটা যৌথ অর্থবোধক শব্দ, যাতে দু’টি অর্থের সম্ভাবনা সমানভাবে থাকে।

যাই হোক, উত্তম হলো পবিত্রাবস্থায় ব্যতীত কেউ মুসহাফ স্পর্শ করবে না। আর আলহামদুলিল্লাহ, এই সমস্যার সমাধান সহজ। কেননা যে নারী ঋতুবর্তী অবস্থায় থাকবে, সে হাতমোজা পরিধান করে কুরআনের পৃষ্ঠা উল্টাতে পারবে ও তাকে ধরতে পারবে।

দ্বিতীয় মাসআলা: ঋতুবর্তী নারীর জন্য আল-কুরআন পাঠ করা, আর এই বিষয়টি নিয়েও আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তাদের মধ্যে

কেউ কেউ বলেন, তার জন্য আল-কুরআন পাঠ করা বৈধ। কারণ, সুন্নাহ’র মধ্যে এমন কোনো স্পষ্ট সহীহ দলীল নেই, যা তাকে এমতাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা থেকে নিষেধ করে, আর এই মতটি বিশুদ্ধতার খুব কাছাকাছি; কিন্তু জরুরি প্রয়োজন না হলে এমতাবস্থায় কুরআন পাঠ না করাটাই উত্তম, আর জরুরি বিষয়টি যেমন, শিক্ষিকা হলে তার ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনে কুরআন পাঠ করা; অথবা সে ছাত্রী, শিক্ষার জন্য বা পরীক্ষার তা পাঠ করতে হয়। সুতরাং এতে কোনো দোষ হবে না ইনশাআল্লাহ।

আর জবাবটি শেষ করার পূর্বে আমি সতর্ক করতে ইচ্ছুক যে, কিছু মানুষ আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ ٧٩﴾ [الواقعة: ٧٩]

“যারা সম্পূর্ণ পবিত্র, তারা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না” [সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: ৭৯]-এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করে যে, অযুবিহীন ব্যক্তি আল-কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু আয়াতটি তা প্রমাণ করে না এবং এর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّهُۥ لَقُرۡءَانٞ كَرِيمٞ ٧٧ فِي كِتَٰبٖ مَّكۡنُونٖ ٧٨ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ ٧٩ ﴾ [الواقعة: ٧٧، ٧٩]

“নিশ্চয় এটা মহিমান্বিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে; যাদেরকে পবিত্র করা হয়েছে, তারা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না”। [সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: ৭৭-৭৯]

এর অর্থ, এই সুরক্ষিত কিতাব পবিত্রকৃত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ করে না, আর তিনি কর্তৃবাচক বিশেষ্যের শব্দ ব্যবহার করে বলেন নি: إِلَّا ٱلْمُطَّهِّرُونَ (পবিত্রতা অর্জনকারীগণ ব্যতীত)। আর যদি অযুবিহীন অবস্থা থেকে পবিত্রতা অর্জনকারীগণ উদ্দেশ্য হত, তবে তিনি বলতেন: لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَّهِّرُونَ (পবিত্রতা অর্জনকারীগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না)।

আর যেহেতু তিনি বলেছেন: ﴿ ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ "যাদেরকে পবিত্র করা হয়েছে", সেহেতু এটা প্রমাণ করে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফিরশতাগণ। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে: ফিরশতাগণ ছাড়া অন্য কেউ এই সুরক্ষিত কিতাব স্পর্শ করে না। আর সুরক্ষিত কিতাব হচ্ছে লওহে মাহফুয। আবার কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐসব সহীফা, যা ফিরশতাদের হাতে বিদ্যমান আছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝١١ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ۝١٢ فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝١٣ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ ۝١٤ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ۝١٥ كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ۝١٦﴾ [عبس: ١١، ١٦]

"কখনো নয়, এটা তো উপদেশ বাণী, কাজেই যে ইচ্ছে করবে সে এটা স্মরণ রাখবে, এটা আছে মর্যাদাসম্পন্ন লিপিসমূহে, যা উন্নত, পবিত্র; লেখক বা দূতদের হাতে, (যারা) মহাসম্মানিত ও নেককার।" [সূরা 'আবাসা, আয়াত: ১১-১৬]

শাইখ ইবন 'উসাইমীন: ফাতাওয়ায়ে মানারুল ইসলাম: ১/১১৫

ঋতুবর্তী ছাত্রীদের প্রাতিষ্ঠানিক নামায ঘরে প্রবেশ করা

প্রশ্ন: মাদরাসার মধ্যে শুধু যোহরের সালাত আদায়ের জন্য একটি মুসাল্লা (নামায ঘর) তৈরি করা আছে, যোহরের সালাতের সময়ে মেয়েদেরকে ঐ ঘরে প্রবেশ করতে বাধ্য করা হয়, অথচ তাদের কেউ কেউ মাসিক অভ্যাসের শিকার। সুতরাং ঐ মুসাল্লা বা নামায ঘরের জন্য কি মাসজিদের বিধান প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ তার জন্য কি তাকে বসা জায়েয (বৈধ) হবে? আর এই অবস্থায় তারা যখন শ্রেণীকক্ষে বসবে, তখন তারা হয়তো অনৈতিক বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবে, সুতরাং তাদেরকে এই মুসাল্লা বা নামায ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য করা যাবে কি?

উত্তর: মাদরাসার (বিদ্যালয়ের) মধ্যকার মুসাল্লা (নামায ঘর) মাসজিদের বিধানের আওতায় আসবে না; বরং তা হলো সালাতের জন্য একটি নির্ধারিত স্থান, আর এমন প্রত্যেক স্থান, যাতে সালাত আদায় করা হয়, তাকে এমন মাসজিদ বলে বিবেচনা করা যাবে না, যার জন্য প্রকৃত মাসজিদসমূহের বিধান প্রযোজ্য হবে, আর মাসজিদ বলা হয় ঐ ঘরকে, যা সার্বজনীনভাবে এবং কাঠামোগত ও পরিষ্কারভাবে শুধু সালাতের জন্য তৈরি করা হয়, আর কোনো জায়গায় সালাত পড়া হয়, শুধু এই কারণে তাকে মাসজিদ বলে গণ্য করা যায় না, আর এর ওপর ভিত্তি করে ঋতুবর্তী নারীর জন্য মাদরাসার (বিদ্যালয়ের) মধ্যকার মুসাল্লা বা নামায ঘরে প্রবেশ করা এবং তাতে অবস্থান করা বৈধ হবে।

শাইখ ইবন 'উসাইমীন

শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য ফাতওয়া (فتاوى للمدرسين و الطلاب): পৃ. ২৪

অপবিত্র অবস্থায় শিক্ষক ও ছাত্রদের আল-কুরআনের পাণ্ডুলিপি স্পর্শ করা

প্রশ্ন: যেই শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে সরাসরি আল-কুরআনের মুসহাফ থেকে শিক্ষা দান করেন, তার জন্য কি পবিত্রতা আবশ্যক, নাকি তার জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়?

উত্তর: এই ক্ষেত্রে শিক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তি সকলেই সমান, তার জন্য অধিকাংশ আলেমের মতে তার জন্য অপবিত্র অবস্থায় আল-কুরআনের পাণ্ডুলিপি স্পর্শ করা বৈধ নয়, তাদের মধ্যে চার ইমাম রহ.ও রয়েছেন। কারণ, ‘আমর ইবন হাযম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لا يمس القرآن إلا طاهر».

“পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কেউ আল-কুরআন স্পর্শ করবে না।” আর এটি একটি উত্তম সনদে বর্ণিত হাদীস, যা ইমাম আবূ দাউদ রহ. ও অন্যান্য বর্ণনাকারী মুত্তাসিল (সংযুক্ত) ও মুরসাল (কর্তিত) সনদে বর্ণনা করেছেন। আর তার কয়েকটি সনদ রয়েছে, যা তার সনদের বিশুদ্ধতা ও ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এই ফাতওয়াই দিয়েছেন, আর আল্লাহই তাওফীক দানের মালিক।

শাইখ ইবন বায

মাজমু‘উ ফাতাওয়া (مجموع فتاوى): ২/৯০

শিশুদের আল-কুরআনের পাণ্ডুলিপি স্পর্শ করা

প্রশ্ন: আমাদের একটি মাদরাসা আছে, যেখানে শিশুরা আল-কুরআন হিফয (মুখস্থ) করে, কিন্তু তাদের পক্ষে সার্বক্ষণিক পবিত্র অবস্থায় থাক সম্ভব হয় না। সুতরাং শিশুদের জন্য আল-কুরআনের পাণ্ডুলিপি স্পর্শ করার জন্য অযু আবশ্যক হবে কি?

উত্তর: তাদের অভিভাবকের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো তাদেরকে এই ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করা এবং অনুরূপভাবে যেই শিক্ষক তাদেরকে শিক্ষা দেন, তার জন্যও আবশ্যক হলো তাদেরকে এই ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করা, যখন তাদের বয়স সাত বছর বা তার চেয়ে বেশি হয়। কারণ, পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও জন্য আল-কুরআনের পাণ্ডুলিপি স্পর্শ করা বৈধ নয়। কেননা এই ব্যাপারে শরী‘আতের দলীল বর্ণিত আছে, আর যার বয়স সাত বছরের নীচে, সে তো আল-কুরআনের পাণ্ডুলিপি স্পর্শ করার যোগ্য বলেই বিবেচিত নয়, যদিও সে অযু করুক না কেন। কারণ, হিতাহিত জ্ঞান না থাকার কারণে তার অযু হয় না।

শাইখ ইবন বায

মাজমু‘উ ফাতাওয়া (مجموع فتاوى): ২/৯২

শিক্ষা বা অধ্যয়নের অজুহাতে সালাত ত্যাগ করা

প্রশ্ন: আমি কীভাবে কাযা (সময় থেকে বিলম্বিত) সালাত আদায় করব, যেহেতু আমি পড়ালেখার কারণে অনেক সময় সালাত আদায়ে বিলম্ব করি? যেমনটি আপনারা জানেন যে, অমুসলিম রাষ্ট্রে সালাতের সময় পাওয়া যায় না; আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক জায়গার জন্য সালাতের সময়সমূহ সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন, আর ছাত্রদের জন্য আবশ্যক হলো, তারা অন্যান্য মুসলিমদের মত সালাতকে তার সময়মত আদায় করবে, আর পড়ালেখার অজুহাত দিয়ে সালাতকে তার নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত করা বৈধ নয়; বরং তা'আলার বাণীর যথাযথ আমল করে সালাতকে যথাসময়ে আদায় করা ওয়াজিব (আবশ্যক)। তিনি বলেছেন:

﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨﴾[البقرة:٢٣٨]

"তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তোমরা দাঁড়াবে বিনীতভাবে।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৮]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣ ﴾ [النساء: ١٠٣]

"নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩] আর তাতে যথাযথ আমল হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ

হাদীসসমূহের প্রতি, যাতে তিনি সালাতের সকল সময়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন।

আর ছাত্রদের মধ্যে যারা জানে না তারা যারা জানে তাদের নিকট প্রশ্ন করবে, আরও প্রশ্ন করবে তার ঐসব বন্ধুবান্ধবকে, যারা সালাতের সময়সমূহ জানে ও বুঝে, এমনকি যত্নসহকারে সময়মত সালাত আদায় করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر».

“আমাদের ও তাদের মাঝে যে প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি রয়েছে, তা হলো সালাত। সুতরাং যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করে, সে কুফুরী করল বা কাফির হয়ে গেল।” ইমাম আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজাহ প্রমূখ বিশুদ্ধ সনদে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম রহ. তার সহীহ গ্রন্থে জাবের ইবন আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ »

“বান্দা এবং শির্ক ও কুফীরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত ত্যাগ করা।”[6] আর এই ব্যাপারে আরও অনেক হাদীস রয়েছে। আল্লাহ সকলের অবস্থাকে সংশোধন করে দিন।

শাইখ ইবন বায: মাজমু‘উ ফাতাওয়া (مجموع فتاوى): ২/১৪১

[6] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬

প্রবাসী ছাত্রের জুম‘আর সালাত ত্যাগ করা

প্রশ্ন: প্রশ্নকারী বলে যে, সে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী ছাত্র, তাদের কাছে মাসজিদ নেই এবং সে দুই বছর ধরে জুম‘আর সালাত কি জিনিস জানে না। সুতরাং তার হুকুম কী হবে?

উত্তর: লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে কোনো দেশে প্রেরিত ছাত্রের জন্য বিধান স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তির বিধানের মত, তার ওপর জুম‘আর সালাত আবশ্যক হবে, যখন সে এক দল স্থায়ী বাসিন্দাকে পাবে। সুতরাং যখন তোমরা সংখ্যায় তিনজন বা তার অধিক হও, তখন তোমরা জুম‘আর সালাত আদায় কর ঘরে অথবা বাগানে অথবা এগুলো ভিন্ন অন্য কোনো জায়গায়; তোমাদের কেউ আযান দিবে এবং তোমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা (ভাষণ) প্রদান ও তোমাদের ইমামতি করবে তোমাদের মাঝে যিনি সবচেয়ে ভালো তিলাওয়াত করতে পারে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝٩ ﴾ [الجمعة: ٩]

হে ঈমানদারগণ! জুমু‘আর দিনে যখন সালাতের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং কেনা-বেচা ত্যাগ কর, এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে। [সূরা আল-জুমু‘আ, আয়াত: ৯। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুম‘আর সালাতের ক্ষেত্রে মুসল্লির সংখ্যা কত হতে হবে, এমন কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার শর্ত করেন নি; কিন্তু তাঁর সুন্নাহ ও আলেমদের ইজমা থেকে জানা যায় যে, জামা‘আত ছাড়া জুমু‘আর সালাত আদায় করা যায় না,

আর জুমু‘আর সালাত আদায় করা দুইয়ের অধিক স্থায়ী বাসিন্দা এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য।

স্থায়ী ফাতওয়া বোর্ড

ফাতওয়ায়ে ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): **১/৪১৬**

(ঈষৎ পরিবর্তিত)

অধ্যয়নের সময় পর্যন্ত ফজরের সালাতকে বিলম্বিত করা

প্রশ্ন: আমার আগ্রহ হলো, আমি সালাত ত্যাগ করব না; তবে আমি বিলম্বে ঘুমাই এবং ঘড়িতে সতর্ক সঙ্কেত (Alarm) বাজানোর সময় নির্ধারণ করি সকাল সাত ঘটিকায় (সূর্য উদয়ের পর); অতঃপর সালাত আদায় করি এবং ক্লাসে গিয়ে উপস্থিত হই, আর বৃহস্পতিবার ও জুমা'বারে বিলম্ব করে ঘুম থেকে জাগ্রত হই, অর্থাৎ যোহরের সালাতের একঘন্টা বা দুই ঘন্টা পূর্বে জাগ্রত হই এবং ঘুম থেকে জাগার পরপরই ফযরের সালাত আদায় করি; যেমনিভাবে আমি অধিকাংশ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে আমার নিজ কক্ষে সালাত আদায় করি এবং মাসজিদে যাই না, যা আমার থেকে বেশি দূরে নয়; আমার এক বন্ধু আমাকে সতর্ক করে বলেছে যে, এটা জায়েয (বৈধ) নয়। সুতরাং উল্লেখিত বিষয়ে মাননীয় পিতা-গুরুর নিকট থেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা কামনা করছি। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন?

উত্তর: যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সূর্য উদয়ের পরে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার জন্য ঘড়ি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ফজরের ফরয সালাত তার সময়মত আদায় করে না, তবে সে ইচ্ছা করেই তা ত্যাগ করে, আর এই কারণে সে একদল আলেমের মতে কাফির হয়ে যায় (আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই) ইচ্ছাপূর্বক তার সালাত ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য; অনুরূপভাবে একই বিধান প্রযোজ্য হবে তার জন্য, যখন সে যোহরের পূর্ব পর্যন্ত ফজরের সালাতকে বিলম্বিত করার ইচ্ছা করবে, অতঃপর যোহরের সালাতের পূর্বে তা আদায় করবে।

আর যে ব্যক্তির ওপর ঘুম প্রভাব বিস্তার করেছে এবং শেষ পর্যন্ত সালাতের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে এতে তার ক্ষতি হবে না এবং এমতাবস্থায় তার ওপর আবশ্যক হলো, যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, তখন সালাত আদায় করে নেবে, আর এতে তার কোনো পাপ হবে না, যখন তার ওপর ঘুম প্রভাব বিস্তার করে অথবা ভুলক্রমে সালাত ত্যাগ করে।

আর যেই মানুষ সালাতকে বিলম্বিত করে নির্ধারিত সময়ের পরে আদায় করার ইচ্ছা করে অথবা ঘড়িতে সতর্ক সঙ্কেত (Alarm) দিয়ে রাখে (সালাতের) সময়ের পরে জেগে উঠার জন্য, শেষ পর্যন্ত সে সময়মত জেগে উঠতে পারল না, তবে এই কাজটি হবে ইচ্ছা করে সালাত ত্যাগ করার শামিল এবং সকল আলেমের মতে সে বড় ধরনের অন্যায় কাজ করেছে; কিন্তু সে কাফির হবে কি, হবে না? এই ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যখন সে তার (সালাতের) আবশ্যকতাকে অস্বীকার করবে না, তখন অধিকাংশ আলেমের মতে এই কারণে সে কাফির হবে না, আর একদল আলেমের মতে এই কারণে তার পক্ষ থেকে বড় ধরনের কুফুরী হবে, আর এই মতটি সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম আজমা‘ঈনের পক্ষ থেকে উদ্ধৃত।

আর সালাতের জামা‘আত ত্যাগ করাটাও অন্যায় এবং অবৈধ; আবশ্যক (ওয়াজিব) হলো মাসজিদে সালাত আদায় করা। কেননা আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, আর তিনি ছিলেন অন্ধ সাহাবী; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তিনি বললেন:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِى قَائِدٌ يَقُودُنِى إِلَى الْمَسْجِدِ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّىَ فِى بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ». فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ « فَأَجِبْ».

“হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কোনো সহায়তাকারী নেই, যে আমাকে সহায়তা করে মাসজিদে নিয়ে আসবে; অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (মাসজিদে হাযির হওয়া থেকে ছুটি চেয়ে) অনুমতি প্রার্থনা করলেন, যাতে তিনি (মাসজিদে উপস্থিত না হয়ে) তাঁর ঘরের মধ্যে সালাত আদায় করতে পারেন; তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর যখন তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি আযানের ধ্বনি শুনতে পাও? জবাবে তিনি বললেন: হ্যাঁ, শুনতে পাই; তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাহলে তার জবাব দাও, অর্থাৎ মাসজিদে উপস্থিত হও।”[7] এই হলো অন্ধ ব্যক্তি, যাকে মাসজিদে পৌঁছিয়ে দেওয়ার মতো কোনো সহায়তাকারী নেই; তা সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং সুস্থ দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি তো আরও উত্তমভাবেই এই নির্দেশের আওতায় আসবে।

আর উদ্দেশ্য হলো, তিনি মুমিনের ওপর মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করাকে বাধ্যতামূলক করবেন। সুতরাং তার জন্য এই ক্ষেত্রে শৈথিল্য

[7] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫১৮

প্রদর্শন করা এবং মাসজিদের নিকটবর্তী ঘরের মধ্যে সালাত আদায় করা বৈধ নয়। আর আল্লাহই তাওফীক দানের মালিক।

শাইখ ইবন বায

মাজমু'উ ফাতাওয়া (مجموع فتاوى): **২/১৮৫**

আবাসিক ছাত্রদের জামা'আতে সালাত আদায় করা থেকে পিছিয়ে থাকা

প্রশ্ন: আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ যোহরের সালাতকে বিলম্বে আদায় করি, তবে আমরা নিয়মিত জামা'আতসহ সালাত আদায় করি; কিন্তু যোহরের সালাতকে আমরা নিয়মিতভাবে মূল (প্রথম) জামা'আতের পরে আদায় করি। সুতরাং নিয়মিতভাবে এটা করা জায়েয (বৈধ) কিনা?

উত্তর: প্রকৃত মাসজিদে এই ধরনের জামা'আতে সালাত আদায়ের পক্ষে আমি মত দেই না। কারণ, এর অর্থ হলো নিয়মিতভাবে তোমাদের কর্তৃক একটি জামা'আতের পর অপর আরেকটি জামা'আত কায়েম করা; বরং তোমরা তোমাদের আবাসিক হলে এক সঙ্গে সালাত আদায় কর এবং মাসজিদকে তার মুসল্লিদের জন্য একাকি সালাত আদায়ের সুযোগ করে দাও।

শাইখ ইবন 'উসাইমীন

লিকাউল বাবিল মাফতুহ (لقاء الباب المفتوح): ৮/২৯

দেশের বাইরে প্রেরিত ছাত্রের কসর ও দুই সালাত একত্রে আদায় করা

প্রশ্ন: আমার জন্য বৃটেনে পড়ালেখাকালীন সময়ে কসর[৮] ও দুই সালাত একত্রে আদায় করা বৈধ হবে কিনা এবং এই অবস্থায় রমযান মাসে কসর ও দুই সালাত একত্রে আদায় করা বৈধ হবে কিনা?

উত্তর: মুসাফির তথা পর্যটকের জন্য দুই সালাত একত্রে আদায় করা বৈধ হবে, যখন সে রাস্তায় পথ চলতে থাকবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য প্রত্যেক সময়ে অবতরণ করাটা তার ওপর কষ্টকর হবে। সুতরাং সে দুই সালাতের যে কোনো একটি সময়ে অবতরণ করবে এবং একই সময়ে দুই সালাত আদায় করবে; হয় প্রথমটির ওয়াক্তে অথবা দ্বিতীয়টির সময়ে, আর যদি সে মুকীম (অবস্থানকারী) হিসেবে অবতরণ করে, তবে সে দুই সালাত একত্রে আদায় করবে না, বরং প্রত্যেক সালাত তার সময়মত আদায় করবে; হয় পরিপূর্ণভাবে আদায় করবে, নতুবা কসর করবে, যদি তা তার জন্য বৈধ হয়, আর কসর তো শুধু ঐ মুসাফিরের জন্য বৈধ, যে সফরের প্রস্তুতির অবস্থায় বহাল থাকবে, যদিও সে প্রয়োজনের কারণে মরুভূমিতে অবতরণ করে এবং যদিও সে শহরের এক প্রান্তে কোনো তাঁবুতে অবতরণ করে তার কোনো দ্রুত প্রয়োজন পূরণের জন্য অপেক্ষা করে, অতঃপর আবার ভ্রমণ করে।

কিন্তু যদি সে শহরের মাঝে অবতরণ করে, সফরকে সংক্ষেপ করে এবং দীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যদিও সে

---

[৮] কসর (قصر) শব্দের অর্থ হল কম করা বা সংক্ষেপ করা; আর সালাতের ক্ষেত্রে কসর হল চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয সালাতসমূহ থেকে দুই রাকাত আদায় করা।- অনুবাদক।

স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নয়, কিন্তু সে একটি কক্ষে বা প্রশস্ত বাড়িতে বসবাস করে এবং তার নিকট প্রয়োজনীয় সকল বিষয় পরিপূর্ণ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে, তবে তার জন্য কসর করার অধিকার নেই, আর এই অবস্থায় সে রমযান মাসের সাওম (রোযা) ভঙ্গ করবে না, যেহেতু তার ওপর সফর অবস্থার কথাটি প্রযোজ্য নয় এবং তার মাঝে ও শহরবাসীর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, আর সালাত পূর্ণ করলে এবং সাওম (রোযা) ভঙ্গ না করলে তার কোনো কষ্ট বা সমস্যা নেই।

শাইখ ইবন জিবরীন

ফাতাওয়া ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ১/৪০৭

অভ্যন্তরীন বিভাগের ছাত্রীগণ কর্তৃক সালাতকে কসর করা

প্রশ্ন: আমি একজন ছাত্রী, আমি আমার পরিবার-পরিজন থেকে দূরে অভ্যন্তরীন বিভাগে বাস করি, আর আমি যে জায়গায় পড়ালেখা করি, তা আমার পরিবার-পরিজন থেকে প্রায় একশত পঞ্চাশ কি. মি. দূরে অবস্থিত এবং আমি প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ও জুমা‘বারে তাদের কাছে আসি; এমতাবস্থায় যেই দুই দিন আমি আমার পরিবার-পরিজনের নিকট অবস্থান করব, সেই দুই দিন এবং যেই পাঁচ দিন অভ্যন্তরীন বিভাগে অবস্থান করব, সেই পাঁচ দিন কি আমি আমার সালাতকে কসর করে আদায় করব, নাকি পরিপূর্ণ করে আদায় করব? আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন?

উত্তর: অভ্যন্তরীন বিভাগে পাঁচ দিন এবং পরিবার-পরিজনের নিকট দুই দিন তোমার অবস্থানকালে তোমার ওপর সালাতকে পরিপূর্ণ করে আদায় করা আবশ্যক, আর তোমার পড়ালেখার শহর এবং পরিবার-পরিজনের শহরের দূরত্বের মাঝখানের রাস্তায় তোমার জন্য চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয সালাতকে কসর করে আদায় করা বৈধ এবং তখন তোমার জন্য আরও বৈধ হলো দুই ওয়াক্তের সালাতকে তাদের এক ওয়াক্তে আগে বা পরে একত্রিত করে আদায় করা। সুতরাং তুমি (সফরকালীন সময়ে) রাস্তায় মুসাফিরের বিধান গ্রহণ করবে এবং বাসায় অবস্থানকালীন সময়ে মুকীম তথা স্থায়ী বাসিন্দার বিধান গ্রহণ করবে।

শাইখ আল-ফাওযান

আল-মুন্তাকা (المنتقى): ১/১৭

দেশের বাইরে প্রেরিত ছাত্র কর্তৃক সালাতসমূহ একত্র করে আদায় করা

প্রশ্ন: কোনো কোনো সময় আমি আসরের সালাতকে মাগরিবের সালাতের সাথে আদায় করি এবং অধিকাংশ সময়ে এই রকম হয়, আর এর কারণ হলো আমি পররাষ্ট্র মিশনে বৃটেনে অধ্যয়ন করি এবং আমি এমন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি, যাতে অযু করার মতো জায়গা নেই, আর সালাত আদায় করার জায়গাও নেই। সুতরাং আমার জন্য আসরের সালাতকে মাগরিবের সালাতের সাথে আদায় করা জায়েয (বৈধ) হবে কি? অথবা আমার জন্য আসরের সালাতকে তার নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় দেড়ঘণ্টা বিলম্ব করে আদায় করা জায়েয (বৈধ) হবে কি?

উত্তর: অবিরাম বৃষ্টি, লাগাতার ভ্রমণ, প্রচণ্ড অসুস্থতা ইত্যাদির মত ওযরের কারণে দুই সালাত একত্রিত করে আদায় করা বৈধ, আর বিনা ওযরে দুই সালাত একত্রিত করে আদায় করা বৈধ নয়; তাছাড়া (ওযরের কারণে) শুধু যোহর ও আসরের সালাতকে তাদের উভয় ওয়াক্তের যে কোনো একটি ওয়াক্তের মধ্যে এগিয়ে বা পিছিয়ে এক সাথে আদায় করবে, আর অনুরূপভাবে মাগরিব ও এশার সালাতকে তাদের উভয় ওয়াক্তের যে কোনো একটি ওয়াক্তের মধ্যে এক সাথে আদায় করবে। আর কোনো প্রকার ওযর ছাড়া সালাতকে তার নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত করে আদায় করা বৈধ নয়। সুতরাং আসরের সালাতকে দ্রুততার সাথে আদায় করাটাই বাঞ্চনীয়। কারণ, হাদীসের মধ্যে বর্ণিত আছে: নিশ্চয়ই যে ব্যক্তির আসরের সালাত ছুটে গেল, সে যেন তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ হারাল। আর প্রশ্নকারী যখন উল্লেখ

করেছে তার কর্মক্ষেত্রে অযু ও সালাত আদায় করার মত কোনো জায়গা পাওয়া যায় না, তখন তার ওপর আবশ্যক হলো যখনই সে অবসর হবে এবং ওযর বা সীমাবদ্ধতা দূর হয়ে যাবে, তখনই সালাত আদায় করে নেয়া এবং তার কর্তব্য হলো দ্রুততার সাথে আসরের সালাতকে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই আদায় করে নেয়া, আর এর পূর্বে যখনই সম্ভব হবে, তখনই তা দ্রুত আদায় করে নেয়া। আর আল্লাহই হলেন তাওফীক দাতা।

শাইখ ইবন জিবরীন

ফতাওয়ায়ে ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ১/৪০৬

অধ্যয়নের অজুহাতে দুই সালাত একত্র করে আদায় করা

প্রশ্ন: আমাদের জন্য দুই সালাত একত্র করে আদায় করা বৈধ হবে কিনা, যখন আমরা পড়ালেখার জন্য বরাদ্দ করা সময়ের ভেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে শহরে এমনভাবে বসবাস করি, তার থেকে বের হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না, অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে কোনো প্রকার সফর, বৃষ্টি ও অসুস্থতা ছাড়াই দুই সালাত একত্রে আদায় করছেন? নাকি আমাদের ওপর ক্লাশ পরিত্যাগ করা এবং সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসা আবশ্যক?

উত্তর: তোমার ওপর আবশ্যক হলো সময়মত পাঁচবার ফরয সালাতসমূহ আদায় করা, আর অধ্যয়নের বিষয়টি তোমার এমন ওযর হিসেবে বিবেচিত হবে না, যার কারণে তোমাকে যে কোনো সালাতকে তার ঐ সময় থেকে বিলম্বিত করে আদায় করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর যে হাদীসটির প্রতি আমি ইঙ্গিত করেছি, তা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব আমল, যা তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। সুতরাং তোমার ওপর আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো, তুমি তোমার পড়ালেখা ও সময়মত সালাত আদায় করার মাঝে সমন্বয় সাধন করবে।

স্থায়ী ফাতওয়া বোর্ড

ফাতওয়ায়ে ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ১/৪০১

মাদরাসার মধ্যে ছাত্রগণ কর্তৃক তিলাওয়াতের সাজদাহ্ আদায় করা

প্রশ্ন: যখন ছাত্রগণ মাদরাসায় এমন কোনো আয়াত পাঠ করে, যাতে সাজদাহ রয়েছে, কিন্তু তারা সাজদাহ আদায় করে নি; ফলে এতে কোনো পাপ হবে কিনা? আর তাদের পক্ষে সাজদাহ আদায় করা উত্তম, নাকি সাজদাহ আদায় না করা উত্তম?

উত্তর: এতে কোনো পাপ হবে না। কারণ, তিলাওয়াতের সাজদাহ আবশ্যক (ওয়াজিব) বিষয় নয়; বরং তা হচ্ছে সুন্নাত, কোনো ব্যক্তি যদি তা আদায় করে, তবে তা উত্তম হবে, আর যদি তা আদায় না করে, তবে তাতে গুনাহ হবে না, আর ছাত্রগণ কর্তৃক তিলাওয়াতে সাজদাহ আদায়ের বিষয়টিতে অনেক সময় বিশৃঙ্খলা বা লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটতে পারে, আবার অনুরূপভাবে তাতে ক্রীড়া-কৌতুক ও হাসি-তামাশা হতে পারে। সুতারাং তাদের জন্য উত্তম হলো এটা না করা, তবে হ্যাঁ, ছাত্ররা যদি মাসজিদে থাকে এবং তারা যদি ভদ্র ও সুশৃঙ্খল হয়, আর পাঠক সাজদাহর আয়াত পাঠ করে, অতঃপর সে নিজে সাজদাহ করে এবং তারাও (ছাত্ররাও) তার সাথে সাজদাহ করে, তাহলে এটা উত্তম হয়। আর আল্লাহই সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন।

শাইখ ইবন ‘উসাইমীন

ফাতাওয়ায়ে মানারুল ইসলাম (فتاوى منار الإسلام): ১/২০৪

পরীক্ষার কারণে রমযান মাসের সাওম পালন না করা

প্রশ্ন: যখন রমযান মাসে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, তখন কি ছাত্রদের জন্য সাওম (রোযা) ভঙ্গ করা বৈধ হবে, যাতে তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়?

উত্তর: পরীক্ষার অজুহাতে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রের জন্য রমযান মাসের সাওম ভঙ্গ করা বৈধ হবে না। কারণ, এটা কোনো শর‘ঈ ওযর নয়; বরং তার ওপর আবশ্যক হলো সাওম পালন করা এবং তার ওপর দিনের বেলায় অধ্যয়নের কাজটি কষ্টকর হলে, রাতের বেলায় অধ্যয়ন করা, আর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের জন্য উচিৎ হবে রমযান মাসকে বাদ দিয়ে পরীক্ষার সময়সূচী তৈরি করে ছাত্রদের প্রতি কোমল আচরণ করা, যাতে সাওমের কল্যাণ ও পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অবসর সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে উভয় প্রকার স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন:

«اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ».

“হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো বিষয়ে শাসনক্ষমতার অধিকারী হলো, অতঃপর সে তাদের ওপর কষ্টকর বোঝা চাপিয়ে দিল, তুমি তার ওপর কষ্টের বোঝা চাপিয়ে দাও, আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো বিষয়ে শাসনক্ষমতার অধিকারী হলো, অতঃপর সে তাদের প্রতি কোমল আচরণ করল, তুমিও তার প্রতি কোমল আচরণ

কর।”[9] সুতরাং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বশীলগণের প্রতি আমার পরামর্শ হলো, তারা যেন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি কোমল আচরণ করেন এবং রমযান মাসের মধ্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ না করে তার পূর্বে বা পরে তারিখ নির্ধারণ করেন। আমরা সকলের জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট তাওফীক কামনা করছি।

শাইখ ইবন বায

ফাতওয়া (الفتاوى): ২/১৬২

(ঈষৎ পরিবর্তিত)

[9] ইমাম মুসলিম রহ. তার সহীহ গ্রন্থে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ৪৮২৬

পরীক্ষার কারণে রমযান মাসে সাওম পালন না করার কাফফারা

প্রশ্ন: আমি একজন তরুণী, পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করেছে ইচ্ছা করে রমযান মাসের ছয়টি সাওম ভঙ্গ করতে, আর তার কারণ ছিল পরীক্ষার তারিখ। কেননা পরীক্ষা শুরু হয়েছে রমযান মাসে ... আর পরীক্ষার বিষয়গুলো ছিল খুবই কঠিন ... আর আমি যদি এই দিনগুলোতে সাওম ভঙ্গ না করতাম, তবে আমার পক্ষে এই কঠিন বিষয়গুলো অধ্যয়ন করা সম্ভব হয়ে উঠত না; আমি জানতে চাচ্ছি যে, আমি কী করব, যাতে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন, আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন?

উত্তর: তোমার কর্তব্য হলো এর থেকে তাওবা করা এবং ঐ দিনগুলোর সাওমের কাযা আদায় করা, যেই দিনগুলোর সাওম তুমি ভঙ্গ করেছ, আর যে তাওবা করে, আল্লাহ তার প্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং তার তাওবা কবুল করেন, আর প্রকৃত তাওবা পরিচয় হচ্ছে যার দ্বারা আল্লাহ পাপসমূহ মুছে দেন; অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা; তা‘আলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও তাঁর শাস্তির ভয়ে তা (অন্যায় ও অপরাধ) ত্যাগ করা, তার পক্ষ থেকে যে অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেছে, তার জন্য লজ্জিত হওয়া এবং সেই অপরাধের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য সত্যিকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, আর অপরাধটি যদি আল্লাহর বান্দাদের প্রতি যুলুম-নির্যাতনমূলক হয়ে থাকে, তবে তার পরিপূর্ণ তাওবা হলো তাদের হক তথা অধিকারসমূহ তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া ...। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١ ﴾ [النور: ٣١]

“হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে আস, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” [সূরা আন-নূর, আয়াত, আয়াত: ৩১। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨]

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, বিশুদ্ধ তাওবা।” [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৮]

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: « التوبة تجب ما قبلها».

“তাওবা তার পূর্বের অপরাধকে বাতিল করে দেয়।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন:

« من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه».

“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি বা অন্য কোনো বিষয়ে যুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে, যেই দিন তার কোনো দিনার বা দিরহাম থাকবে না। সেই দিন তার কোনো সৎকর্ম থাকলে, তার যুলুমের পরিমাণ তার নিকট থেকে নেওয়া হবে, আর যদি তার সৎকর্ম না থাকে, তাহলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে নিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।”[10] আর আল্লাহই তাওফীক দানের মালিক।

শাইখ ইবন বায: ফাতওয়ায়ে ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ২/১৬০

---

[10] ইমাম বুখারী রহ. তার সহীহ গ্রন্থে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ২৩১৭

ছাত্রদের জন্য মাসিক বৃত্তি ভোগ করা অবস্থায় ঈদুল ফিতরের সাদকা

প্রশ্ন: আমরা একদল প্রবাসী ছাত্র, সুতরাং আমাদের ওপর কি যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব (আবশ্যক), অথচ আমরা অন্যান্য ছাত্রদের মত মাসিক বৃত্তি ভোগ করি, বিষয়টি যখন এই রকম, তখন আমাদের ওপর কি পরিমাণ যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে? আর এর মাধ্যমে আমাদের জন্য এখানকার মিসকীনদেরকে সাদকা করা জায়েয হবে কিনা অথবা তা মাসজিদ নির্মাণের কাজে দান করা যাবে কিনা এবং কখন আমরা তা ব্যয় করব, আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন?

উত্তর: যাকাত বলতে যদি সাদকাতুল ফিতর তথা ঈদুল ফিতরের সাদকাকে বুঝায়, তাহলে তা অন্যান্য মুসলিমদের মতো তোমাদের ওপরও ওয়াজিব (আবশ্যক) হবে, আর তা হলো সংশ্লিষ্ট দেশে প্রচলিত খাদ্যশস্য যেমন- গম, ভুট্টা, চাউল ইত্যাদি থেকে এক সা পরিমাণ; আধুনিক মাপে তার পরিমাণ হলো প্রায় তিন কিলোগ্রাম, যা ঈদের দিন সকাল বেলায় ঈদুল ফিতরের সালাতের পূর্বে অথবা ঈদের রাত্রির এক দিন বা দুই দিন পূর্বে গরীব-মিসকীনদেরকে প্রদান করবে; যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ করতেন, আর ঈদের সালাতের পর পর্যন্ত বিলম্বিত করা বৈধ হবে না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণ ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই তা দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম বুখারী রহ. তার সহীহ গ্রন্থে এই বর্ণনাটির উল্লেখ করেছেন।

আর তোমাদের মাসিক বৃত্তির মধ্যে তোমাদের ওপর যাকাত আবশ্যক হবে না, তবে যখন তোমরা তার থেকে কিছু সঞ্চয় করবে এবং তার

ওপর এক বছর অতিবাহিত হবে, তখন তোমাদের ওপর তার যাকাত ওয়াজিব হবে, যদি তা নিসাব পরিমাণে উন্নীত হয়। আর নিসাব হলো একশত চল্লিশ মিসকাল রৌপ্য অথবা বিশ মিসকাল স্বর্ণ অথবা তার সমমূল্য পরিমাণের অপর যে কোনো মুদ্রা।

আর তোমাদের আশপাশে বিদ্যমান নিঃস্ব মুসলিমদেরকে তা দান করাটাই সর্বোত্তম, আর অধিকাংশ আলেমের মতে মাসজিদ নির্মাণের জন্য তা দান করা বৈধ নয়।

আর স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ডলার, ইউরো, টাকা ইত্যাদির মত তার স্থলাভিষিক্ত মুদ্রাসমূহ থেকে যাকাতের উপযুক্ত সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ তথা শতকরা ২.৫% যাকাত হিসেবে প্রদান করা ওয়াজিব (আবশ্যক)। আর আল্লাহই হলেন তাওফীক দানকারী।

শাইখ ইবন বায

ফাতওয়া সংকলন (مجموع فتاوى): ৩/১১১

ছাত্রদের বাক্সে জমাকৃত টাকা-পয়সার যাকাত

প্রশ্ন: বাদশা সা'ঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ছাত্রদের একটি তহবিল আছে, আর তা হলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থ সরবরাহ ও ছাত্রদের বৃত্তির টাকা থেকে একটি ক্ষুদ্র অংশ সংগ্রহের দ্বারা পরিচালিত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা। এই বাক্সের (তহবিলের) মধ্যে দরিদ্র ছাত্রদের সহযোগিতা করা হয়। এই বাক্সের (তহবিলের) মধ্যে জমাকৃত নিসাব পরিমাণ সম্পদের যাকাত দেওয়া লাগবে কিনা?

উত্তর: উল্লেখিত বাক্সের (তহবিলের) সম্পদ এবং তার অনুরূপ কোনো সম্পদের মধ্যে যাকাত নেই। কারণ, তা এমন সম্পদ, যার কোনো নির্দিষ্ট মালিক নেই; বরং তা হলো ভালো কাজে দানকৃত অপরাপর সকল ওয়াক্‌ফ সম্পদের মতো।

শাইখ ইবন বায

ফাতওয়ায়ে ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ২/৮৬

প্রবাসী ছাত্রদের পক্ষ থেকে কুরবানী

প্রশ্ন: যে প্রবাসী ছাত্র তার পরিবারের (পিতা-মাতা ও ভাই-বোনের) ব্যয়ভার বহন করে, তারা (পরিবার) তার পক্ষ থেকে তাদের দেশে কুরবানি করলে তা যথেষ্ট হবে কিনা? অনুরূপভাবে বিবাহিত ছাত্র, কিন্তু তার সাথে তার পরিবার নেই ... সে কি এখানে কুরবানি করবে, নাকি তার পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের দেশে কুরবানি করবে ...?

উত্তর: কুরবানি দাতার দেশে এবং তার বাড়িতেই কুরবানির পশু জবাই করা হবে। অতঃপর সে এবং তার পরিবার-পরিজন তার থেকে খাবে, আর তা থেকে সে তার প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে হাদিয়া (উপহার) দিবে এবং গরীবদেরকে দান করবে। আর যখন তার পরিবার-পরিজন অন্য দেশে অবস্থান করবে, তবে অবশ্যই তার পক্ষ থেকে ও তাদের পক্ষ থেকে কুরবানির পশু তার দেশে এবং তার বাড়িতেই জবাই করা হবে, যদিও সে ভিন্ন দেশে অবস্থান করে।

শাইখ আল-ফাওযান

ফাতওয়া (الفتاوى): ২/৯

পশ্চাদভাগের নিতম্ব কর্তিত ছাগল দ্বারা কুরবানী

প্রশ্ন: এখানে আমেরিকাতে একটা বিরাট সংখ্যক প্রবাসী ছাত্র রয়েছে, আর পবিত্র ঈদুল আযহা একেবারে দরজায় উপস্থিত। এমতাবস্থায় তারা কুরবানির পশু সম্পর্কে প্রশ্ন করছে; বিশেষ করে আমেরিকাতে ভেড়ার পশ্চাদভাগের নিতম্ব তার ছোট বয়সে কেটে ফেলা হয়, যাতে তার পিঠে চর্বি জমে। এই প্রকারের ভেড়া দিয়ে আমরা কুরবানি করলে তা যথেষ্ট হবে কি? জেনে রাখা দরকার যে, সেখানে গরু পাওয়া যায়, কিন্তু কেউ কেউ আবার গরুর গোশত খেতে পছন্দ করে না...?

উত্তর: কুরবানি হিসেবে উল্লেখিত ছাগল বা ভেড়া জবাই করাতে কোনো সমস্যা নেই, যদিও তা পশ্চাদভাগের নিতম্ব কর্তিত হয়। কারণ, এর গোশ্‌তকে সুস্বাদু কারার জন্য তা কাটা হয়। সুতরাং তা পুরুষ ছাগলকে তার মাংস সুস্বাদু কারার জন্য খাসি করার মত। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাসি ছাগল দ্বারা কুরবানি করেছেন।

শাইখ আল-ফাওযান

ফাতাওয়া (الفتاوى): ২/৯৪

প্রবাসী ছাত্রদের শূকরের মাংস খাওয়া

প্রশ্ন: প্রশ্নকারী বলে: একটি বিষয় যেকোনো উদ্দেশ্যে ইউরোপ ও আমেরিকাগামী প্রতিটি মুসলিমের মনকে চিন্তান্বিত করে তোলে। আর তা হলো, কীভাবে তার জন্য তার সামনে পেশ করা বা তার ক্রয় করা খাদ্যদ্রব্য চেনা সহজসাধ্য হবে যে, তা শূকরের চর্বিমুক্ত খাদ্য হওয়া উচিৎ, অথচ তা পশ্চিমা সমাজে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হয়? কীভাবে সে নিশ্চিত হবে যে, সে যা খাচ্ছে, তা ইসলামী শরী'আত ও সুন্নাতে মুহাম্মাদী অনুয়ায়ী হচ্ছে?

আরও বলে: যদি তাই হয়, তাহলে এসব পরিস্থিতিতে অধিকাংশের পক্ষে কাজ করা কী করে সম্ভব হবে— এই প্রশ্নটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঐসব ব্যক্তির জন্য যাদেরকে পরিস্থিতি বাধ্য করেছে পশ্চিমা সমাজে জীবনযাপন করার জন্য, চাই তা কর্মের জন্য হউক অথবা শিক্ষার জন্য। অতএব, আমরা এই প্রশ্নটি পেশ করছি শিক্ষা-গবেষণা, ফাতওয়া, দা'ওয়াত ও পরামর্শ সংস্থার সভাপতি মাননীয় শাইখ আবদুল আযীয ইবন আবদিল্লাহ ইবন বাযের নিকট, যাতে তিনি আমাদের প্রবাসী ছেলেদের অনেককে একটু স্বস্তি দিতে পারেন, যাদের অনেক প্রশ্ন এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে; এমনকি তাদের কেউ কেউ এই মত বা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছে যে, তাদের এই অবস্থা হচ্ছে জরুরি অবস্থা, আর জরুরি অবস্থা নিষিদ্ধ (হারাম) জিনিসকে বৈধ করে দেয়। এটি কি এমন বিষয় যা ইসলামী শরী'আত অনুমোদন করে না, নাকি এখানে জরুরি অবস্থার হুকুমের দিকে না গিয়ে অন্য কোনো সমাধান আছে?

উত্তর: লেখক ভাইকে এই সমস্যাটিকে গুরুত্ব দেওয়া এবং তার সমাধান খোঁজার জন্য ধন্যবাদ, আর আমি তার প্রশ্নটির উত্তর সংক্ষিপ্ত কথার মাধ্যমে দেওয়ার আশা রাখি এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যাতে এর দ্বারা উপকৃত করেন। সুতরাং আমি বলছি:

প্রথমত: কোনো সন্দেহ নেই যে, বহির্বিশ্বে প্রবাসী ছাত্র তার খাওয়া, পানীয়, আগমন, প্রস্থান ও আল্লাহ তা'আলা যেসব ইবাদত ফরয করেছেন, সেগুলো আদায়ের ক্ষেত্রে বহু ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। আর এর উপরে সে বড় ধরনের বিপদ দ্বারা পরিবেষ্টিত, যেখানে যুবকগণ ফিতনা, পথভ্রষ্টতার আহ্বায়ক, বেহায়াপনার ধারক-বাহক এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যবাদী সংস্থাসমূহের সৈনিকদের মুখোমুখি হতে হয়। আর এর থেকে রক্ষাকারী কেউ নেই, তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেছেন, সেই পরিত্রাণ পেতে পারে। এই জন্য মুসলিম ছাত্রের জন্য উচিৎ হবে না যে, সে নিজ দেশে পড়ালেখা ছেড়ে ভিন্ন দেশে পড়ালেখার জন্য ভ্রমণ করবে এবং নিজেকে বড় ধরনের বিপদ ও বিশৃঙ্খলা বা বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবে।

তবে রাষ্ট্র যখন নির্দিষ্ট কিছু লোকজনকে বিশেষ কিছু বিষয়ের ওপর পড়ালেখা করানোর জন্য বহির্বিশ্বে পাঠাতে বাধ্য হয়, যেই বিষয়গুলো ঐ রাষ্ট্রে এবং অন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে পাওয়া না যায়, তখন রাষ্ট্রের উচিৎ হবে একদল মেধাসম্পন্ন, দীনদার ও ইসলামের বিধানাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বাইরে পাঠানোর জন্য নির্বাচিত করা, অতঃপর তারা বিভিন্ন স্থানে বা দেশে অত্যন্ত সতর্কতা, সাবধানতা এবং প্রচণ্ড মনোযোগ ও নিয়মানুবর্তিতা সহকারে ঐসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবে,

আর এই শিক্ষাগ্রহণ শেষ হওয়ার পরে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের দেশে ফিরে আসবে।

দ্বিতীয়ত: নিশ্চয়ই তা'আলা তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন এবং কীসের মাধ্যমে তাদের উপকার হবে ও কীসে তাদের ক্ষতি হবে, সেই সম্পর্কে খবর রাখেন, আর তিনি তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ইসলামের বিধিবিধান অবতীর্ণ করেছেন, যা সকল প্রকার কল্যাণ নিয়ে এসেছে এবং সকল অনিষ্টকর বিষয় ও বস্তু থেকে সতর্ক করে দিয়েছে, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহকে হারাম (নিষিদ্ধ) ঘোষণা করেছেন তার মধ্যে ক্ষতি বিদ্যমান থাকার কারণে, যেই ক্ষতির কিছু সম্পর্কে তারা জানে এবং কিছু সম্পর্কে তারা জানে না। আর সেই নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হলো শূকরের মাংস, যা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও মুসলিমগণের মধ্যে সংঘটিত ইজমার প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ﴾ [البقرة: ١٧٣]

“তিনি তো কেবল তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশ্ত ...।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭৩]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ ﴾ [الانعام: ١٤٥]

“বলুন, ‘আমার প্রতি যে ওহী হয়েছে তাতে, লোকে যা খায় তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না, মৃত, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ছাড়া।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৪৫]

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে আছে:

« إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ »

“নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ, মৃত জন্তু, শূকর ও মূর্তি ক্রয়-বিক্রয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।”

সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ শূকরের মাংস নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে, আর আলেমগণ এই ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। কোনো কোনো আলেম রহ. বলেন, “শূকরের সকল অংশ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।” আল্লাহ তা‘আলা অপবিত্র বস্তুসমূহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ হিকমত ও তাৎপর্যের কারণে, যা তিনি জানেন, যদিও তা অন্যের নিকট অস্পষ্ট করে রাখা হয়েছে; আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদিও আল্লাহ তা‘আলা কোনো কোনো সৃষ্টির নিকট তাঁর কোনো কোনো বস্তু নিষিদ্ধ ঘোষণার রহস্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন, তবে তাদের নিকট অধিকাংশ রহস্য ও তাৎপর্য গোপন রাখা হয়েছে। আর শূকরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার মধ্যে যে হিকমত ও তাৎপর্য রয়েছে, তা হচ্ছে, (আর এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন,) এর সাথে ময়লা-আবর্জনার যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার সাথে জড়িয়ে আছে বহু রকমের ক্ষতি ও শারীরিক ও মানসিক রোগ-ব্যাধি। আর এই জন্যই এর প্রিয় খাবার হলো ময়লা-আবর্জনা ও অপবিত্র বস্তুসমূহ। আর এই প্রাণীটি সকল অঞ্চল বা

মহাদেশেই ক্ষতিকারক; বিশেষ করে উষ্ণ অঞ্চলে, যা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত। আর এর গোশ্ত ভক্ষণ করাটা প্রাণবিনাশী একমাত্র কৃমির উৎপত্তির অন্যতম কারণ। আরও বলা হয় যে, সচ্চরিত্রতা ও ব্যক্তিত্ব-আত্মসম্মাবোধের মধ্যে এর কুপ্রভাব পড়ে, আর এর বাস্তব সাক্ষী হলো ঐসব দেশের অধিবাসীদের অবস্থা, যারা শূকরের মাংস ভক্ষণ করে। আর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এমন অনেক বাস্তব অবস্থায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, অধিকাংশ শূকরের মাংসভোজী ব্যক্তি এমন রোগ-ব্যাধীতে আক্রান্ত হয়, যা নিরাময়ে আধুনিক চিকিৎসা ব্যর্থ হয়। যদিও ক্রমবিকাশমান আধুনিক চিকিৎসা শূকরের মাংস ভক্ষণ করার অনেক ক্ষতি চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে; তবুও এর অন্যান্য যেসব ক্ষতি গোপন রয়েছে এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান যা নির্ণয় করতে পারে নি, তা হয়তো এর কয়েক গুণ।

তৃতীয়ত: অন্তরের পরিশুদ্ধতা, দো‘আ কবুল ও ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে হালাল ও পবিত্র খাবার খাওয়ার মহান প্রভাব রয়েছে, যেমনিভাবে হারাম বস্তু থেকে খাদ্য গ্রহণ তার (দো‘আ ও ইবাদতের) গ্রহণযোগ্যতাকে বাধাগ্রস্ত করে। আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহূদীদের প্রসঙ্গে বলেন,

﴿أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمۡۚ لَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٤١ سَمَّـٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ﴾ [المائدة: ٤١، ٤٢]

“এরাই হচ্ছে তারা যাদের হৃদয়কে আল্লাহ বিশুদ্ধ করতে চান না; তাদের জন্য আছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা, আর তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতে মহাশাস্তি। তারা মিথ্যা শুনতে খুবই আগ্রহশীল এবং অবৈধ সম্পদ খাওয়াতে অত্যন্ত আসক্ত।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪১-৪২] অর্থাৎ

হারাম বা নিষিদ্ধ সম্পদ খাওয়াতে আসক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তির গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই, তাহলে আল্লাহ কীভাবে তার অন্তরকে পবিত্র করবেন এবং কীভাবে তার দো'আ কবুল করবেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ». ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ».

“হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ মুমিনদেরকে ঐ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, যে বিষয়ে তিনি নবী-রাসূলদেরকেও নির্দেশ দিয়েছেন,” অতঃপর তিনি বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٥١﴾ [المؤمنون: ٥١]

“হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে খাদ্য গ্রহণ কর এবং সৎকাজ কর; তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আমি অবহিত।” [সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ৫১]

আর বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ ﴾ [البقرة: ١٧٢]

“হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমরা যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে খাও।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭২] অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে, "দীর্ঘ সফর করে যার এলোমেলো চুল, ধুলায় ধুসরিত সে, আকাশের দিকে দু'হাত তুলে বলে: 'হে আমার রব! হে আমার রব!' অথচ তার খাদ্য হারাম, পোষাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং তার শরীর গঠিত হয়েছে হারামে। অতএব, তার দো'আ কীভাবে কবুল করা হবে?"[11]

চতুর্থত: যখন পূর্বোক্ত বিষয়গুলো জানা গেল, তখন মুসলিম ব্যক্তির ওপর আবশ্যক হলো, তা'আলাকে ভয় করা, হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকা এবং নিজেকে এমন স্থানে নিয়ে না যাওয়া যেখানে আল্লাহর আনুগত্য করা ও তাঁর বিধিবিধানসমূহ পালন করা সম্ভব হয়ে উঠবে না, আর মুসলিম ব্যক্তির জন্য উচিৎ হবে না যে, সে নিজেকে নিয়ে এই জায়গায় অবস্থান করবে, অতঃপর আলেমদের স্মরণাপন্ন হবে এবং বলবে: আমি ইসলাম থেকে এই সমস্যার সমাধান চাই, আর এটা সত্য যে, একমাত্র ইসলামের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করার মাধ্যমেই সকল সমস্যার সমাধান হবে; তবে কোনো এক দিককে অবজ্ঞা করা অথবা তাতে শৈথিল্য প্রদর্শন করা এবং শুধু একটি দিককে গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়াটা কোনো প্রকার সুফল বয়ে আনে না।

পঞ্চমত: প্রবাসী ছাত্রের জন্য তার জরুরি অবস্থার দোহাই দিয়ে এবং জরুরি অবস্থা নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করে দেয়- এমন দাবি করে শূকরের মাংস অথবা তার কোনো অংশ থেকে ভক্ষণ করা বৈধ হবে না। কারণ, এটা ভুল ধারণা। কেননা প্রবাসী ছাত্রকে সেখানে যেতে এবং নিয়মিতভাবে সেখানে অবস্থান করতে বাধ্য করা হয় নি, আর সে

[11] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৯৩

শূকরের মাংস ভক্ষণ না করলে কখনও মরবে না। আর যিনি এই প্রশ্ন করেছেন, তিনি যে অন্যান্য সমাধান চেয়েছেন তা (পূর্বে বর্ণিত বিষয়সহ) তা'আলার তাকওয়া থেকেই উৎসারিত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿...وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ۝٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ...﴾ [الطلاق: ٢، ٣]

"... আর যে কেউ আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ বের করে দেবেন এবং তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন; ...।" [সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ২, ৩] আর উপস্থিত ব্যক্তি এমন কিছু দেখেন, যা অনুপস্থিত ব্যক্তি দেখে না, আর মুসলিম দেশসমূহে সহজে যে ভোজ্য তেল পাওয়া যায়, সম্ভব হলে প্রবাসী ছাত্র তার থেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী সাথে করে নিয়ে যাবে অথবা তার নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করবে অথবা প্রবাসীগণ জোটবদ্ধভাবে একত্রিত হয়ে তাদের নিজেদের জন্য শরী'আত সম্মত বৈধ খাবার তৈরি করবে। যেমন, মাছ ও অনুরূপ অন্যান্য খাবার, আর যদি প্রয়োজন হয়, তবে তারা নিজেদের জন্য (হালাল পশু বা পাখি) জবাইয়ের ব্যবস্থা করবে, আর এই ক্ষেত্রে যে কষ্ট-ক্লেশ হবে, উচিৎ হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ও হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য সেই কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা।

পরিশেষে, আমি আবারও ঐ ভাইটিকে ধন্যবাদ জানাই... যিনি এই সমস্যার কথাটি উত্থাপন করেছেন এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন মুসলিম সন্তানদেরকে তাদের প্রতিপালকের আনুগত্য

করা, তাঁর শরী'আতকে কর্তব্য মনে করার, তাঁর বিধিবিধান অনুযায়ী আমল করার এবং তাঁর শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকার তাওফীক দান করেন, তিনি হলে সর্বশ্রোতা, খুব নিকটবর্তী, আর তিনি হলেন পবিত্র, সরল পথ প্রদর্শনকারী।

و صلى الله و سلم على عبده و رسوله محمد و آله و صحبه أجمعين.

শাইখ ইবন বায

ফাতাওয়ায়ে ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): **৩/৩৯৩**

(ঈষৎ পরিবর্তিত)

লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার জন্য মানত করা

প্রশ্ন: জনৈক ছাত্রী মাদরাসার কোনো একটি বিষয়ে অকৃকার্য হয়েছে, অতঃপর সে প্রচণ্ডভাবে রেগে গিয়ে বলল: আল্লাহর কসম! আমি যদি পুনরায় মাদরাসায় ফিরে যাই, তাহলে আমি দুই বছর সাওম (রোযা) পালন করব; অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে মাদরাসায় যাওয়ার ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করল এবং তাকে উৎসাহ দিতে শুরু করল, অতঃপর সে ঐ বিষয়টি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মাদরাসায় গেল। সুতরাং এই ব্যাপারে তার কাফফারা কি হবে?

উত্তর: এই প্রশ্নের উত্তরের দু'টি অংশ:

প্রথম অংশ: কোনো মানুষের জন্য দ্রুত রেগে যাওয়া উচিৎ নয়, আরও উচিৎ নয় এমন সব পরিশ্রম করাকে আবশ্যক করে নেয়া, যার শক্তি-সামর্থ্য তার নেই। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণকে এমন কাজের আগ্রহ প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন, যা তাকে উপকৃত করবে, আর সে আল্লাহ কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং অক্ষমতা প্রকাশ করবে না। সুতরাং সে যদি চেষ্টা-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ ও প্রতিপালকের নিকট সাহায্য কামনার পর কিছু অর্জন করে অথবা উদ্দেশ্য হাসিল না হয়, তবে সে যেন বলে: এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য নির্ধারিত এবং তিনি যা চেয়েছেন, তাই করেছেন, আর এর মাধ্যমেই তার দুনিয়ার জীবন সুন্দর ও সুখময় হবে।

দ্বিতীয় অংশ: যখন তুমি মাদরাসায় ফিরে যাবে, তখন তোমার ওপর আবশ্যক হলো শপথের কাফফারা দিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ দশ জন মিসকীনকে খাবার খওয়াবে, আর তাদেরকে খাবার খাওয়ানোর দু'টি

পদ্ধতি হতে পারে: হয় তুমি খাবার তৈরি করবে এবং তাদেরকে দুপুর বা রাতের খাবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে অথবা তুমি তাদের মাঝে মধ্যম মানের রান্নাবিহীন খাবার বণ্টন করে দেবে, যা সাধারণত লোকজন তাদের পরিবার-পরিজনকে খাওয়ায়, আর বর্তমানে তা হলো চাল এবং তার সাথে থাকবে গোশত বা অনুরূপ কোনো তরকারি। কারণ, এটা হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম, আর প্রতি দশ জনের জন্য দুই সা‘[12] চালই যথেষ্ট, অর্থাৎ পাঁচ জনের জন্য এক সা‘, আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

শাইখ ইবন ‘উসাইমীন

ফাতাওয়ায়ে মানারুল ইসলাম (فتاوى منار الإسلام): ৩/৬৬১

[12] সা‘ হচ্ছে, পৌনে চার কেজি পরিমাণ গম ধরে এমন পাত্রের পরিমান (প্রায়)। -সম্পাদক।

পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার মানত করা

প্রশ্ন: আমার একটি বোন মাদরাসায় পড়ালেখা করে; সে মানত করেছে যে, সে যাতে অবশ্যই ইতিহাস বিষয়ে অকৃতকার্য হয়; সে বলেছে: আমার মানত হলো, আমি কখনও পরীক্ষায় কৃতকার্য হব না; আমার মানত হলো, অবশ্যই আমি অকৃতকার্য হব। কিন্তু সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে। সুতরাং এই মানতের বিধান কী হবে? তার ওপর কি এই মানত পূরণ করা ওয়াজিব হবে?

উত্তর: আমরা বারবার আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে উপদেশ পেশ করেছি যে, তারা যেন মানত না করে। কেননা মানত করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «لا يأتي بخير» (তা কল্যাণ আনতে পারে না), আর মানুষ এর মাধ্যমে তার নিজের জন্য এমন কিছুকে আবশ্যক করে নেয়, যা থেকে সে মুক্ত।

আর এই ছাত্রীটি, যে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার মানত করেছে, সম্ভবত সে এই মানত করেছে তার এই ধারণা থেকে যে, নিশ্চয়ই সে অকৃতকার্য হবে; অতঃপর বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো তার ধারণার বিপরীত, আর এটার ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, তার ওপর কোনো কিছুই আবশ্যক হয় নি। কারণ, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যে ভবিষ্যৎ কোনো কিছুর ব্যাপারে শপথ করে এমন প্রত্যয়ের ভিত্তিতে যে, তা অচিরেই হবে অথচ বাস্তবে প্রকাশ পেয়েছে তার উল্টো; এ অবস্থায় তার ওপর কোনো কিছুই আবশ্যক হবে না।

তবে সে যদি এমন কোনো কাজের বিষয়ে শপথ করে, যা সে করতে চায়, সে ইচ্ছা করলে তা করতে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে সে তা বর্জনও করতে পারবে; কিন্তু যদি সে তা না করে, তবে তার ওপর কাফফারা ওয়াজিব (আবশ্যক) হবে। আর আল্লাহই হলেন তাওফীক দানকারী।

শাইখ ইবন 'উসাইমীন

ফাতাওয়ায়ে মানারুল ইসলাম (فتاوى منار الإسلام): ৩/৬৭৪

ইদ্দত পালনরত ছাত্রীর মাদরাসায় গমন

প্রশ্ন: কোনো এক ব্যক্তি এই কথা বলে প্রশ্ন করেন যে, তার এক কন্যার স্বামী মারা গিয়েছে এবং তার ওপর আবশ্যক হলো (স্বামী হারানো শোকের) ইদ্দত পালন করা, অথচ সে মাদরাসায় (বিদ্যালয়ে) অধ্যয়নরত ছাত্রী। সুতরাং তার জন্য পড়ালেখা অব্যাহত রাখা জায়েয (বৈধ) হবে কিনা? আর প্রশ্নকর্তা বলেন, সম্ভবত সে এমন কিছু কাপড় পরিধান করবে, যা সুগন্ধি ও সাজ-সজ্জা থেকে মুক্ত তবুও কি তা জায়েয হবে?

উত্তর: যে স্ত্রীর স্বামী মারা গিয়েছে, তার ওপর ওয়াজিব (আবশ্যক) হলো, সে তার ঐ ঘরে ইদ্দত পালন করবে, যাতে তার স্বামী মারা গিয়েছে, আর তাতে সে চার মাস দশ দিন অবস্থান করবে এবং তাতে ছাড়া অন্য কোথাও সে রাত্রিযাপন করবে না, আর তার ওপর আবশ্যক হলো, যা তাকে সুন্দর করে ও তার প্রতি অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এমন কিছু থেকে দূরে থাকবে, যেমন, সুগন্ধি, সুরমা, চাকচিক্যময় পোষাক, তার শরীরকে অলঙ্কার দিয়ে সাজানো এবং অনুরূপ যা তার সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে, তা থেকে দূরে থাকবে, আর কোনো প্রয়োজনের কারণে বাধ্য হলে তার জন্য দিনের বেলায় বের হওয়া বৈধ হবে, আর এর ওপর ভিত্তি করে যে ছাত্রীর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে, তার জন্য শিক্ষা গ্রহণ ও মাসআলা-মাসায়েল অনুধাবন করার প্রয়োজনে মাদরাসায় গমন করা বৈধ হবে, তবে তাকে স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালনকারিনী নারীর ওপর যেসব বস্তু বা বিষয় থেকে দূরে থাকা আবশ্যক, সেসব থেকে দূরে থাকাকে আবশ্যকীয় কর্তব্য বলে গ্রহণ

করবে, যাতে পুরুষগণ তাকে দেখে বিভ্রান্ত না হয় এবং তাকে বিয়ের প্রস্তাব দানের দিকে ধাবিত না করে।

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড

ফাতওয়ায়ে ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): **৩/৩১৯**

সহশিক্ষা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠানে প্রবাসী ছাত্রের লেখাপড়া

প্রশ্ন: আমি একজন প্রবাসী ছাত্র, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি তাতে ছেলে ও মেয়েরা এক সঙ্গে পাশাপাশি পড়াশুনা করে; আমার প্রশ্ন: আমার জন্য ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা জায়েয (বৈধ) হবে কিনা?

উত্তর: যে মুসলিম ব্যক্তি তার নিজের মুক্তি চায়, আমরা তাকে উপদেশ প্রদান করি, সে যাতে অনিষ্টতা ও ফিতনা তথা বিপর্যয়ের সকল উপায়-উপকরণ থেকে দূরে অবস্থান করে, আর কোনো সন্দেহ নেই যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যুবতীদের সাথে যুবকদের মিশ্রণে সহশিক্ষা হলো ফিতনা-ফ্যাসাদে নিপতিত হওয়া ও যিনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। আর কোনো ব্যক্তি যদি তার নিজেকে হিফাযত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে, তবে তাকে অবশ্যই কঠোর সাধনা করতে হবে; কিন্তু কোনো ব্যক্তি যখন এর দ্বারা পরীক্ষার শিকার হয়, তখন তার ওপর আবশ্যক হলো নিজেকে হিফাযত করা, সেখান থেকে দূরে সরে যাওয়া, দৃষ্টিকে অবনমিত রাখা, লজ্জাস্থানকে হিফাযত করা এবং যতটা সম্ভব হয় নারীদের নিকটবর্তী না হওয়া, আর আল্লাহই ভালো জানেন।

শাইখ ইবন জিবরীন

ফাতওয়ায়ে ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ৩/১০২

বাসের মধ্যে ছাত্রীদের চেহারা খোলা রাখা

প্রশ্ন: সম্মানিত শাইখ, আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন— বাসে বা অন্য কোনো পরিবহণে ছাত্রীদেরকে তাদের মুখমণ্ডল খোলা অবস্থায় মাদরাসার (বিদ্যালয়ের) উদ্দেশ্যে বহন করে আনা-নেওয়ার বিধান কী হবে?

উত্তর: নারীর মুখমণ্ডল খোলা রাখা এবং তার দিকে পুরুষদের তাকানো হারাম এবং অবৈধ; চাই সে শিক্ষিকা হউক অথবা ছাত্রী হউক, চাই সে গাড়ীর মধ্যে থাকুক অথবা বাজারের মধ্যে পায়ে হেঁটে চলাফেরা করুক, কিন্তু যদি সে এমন গাড়ীতে থাকে, যাতে গ্লাস আড়াল হওয়ার কারণে গ্লাসের বাইরে যারা আছে, তারা তাকে দেখতে পায় না এবং চালক ও মহিলাদের মধ্যে আড়াল থাকে, তবে এই অবস্থায় তাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখাতে কোনো পাপ হবে না। কারণ, তারা স্বতন্ত্র কক্ষে পুরুষদের থেকে পৃথকভাবে অবস্থানরত নারীদের মত। আর যখন গাড়ীর গ্লাস এমন স্বচ্ছ হয়, যার অপর পাশ থেকে দেখা যায় অথবা গাড়ীর গ্লাস অস্বচ্ছ হয়, কিন্তু তাদের ও চালকের মাঝখানে কোনো আড়াল না থাকে, তাহলে তাদের জন্য তাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখা বৈধ হবে না, যাতে তাদেরকে চালক অথবা বাজারের মধ্যকার কোনো পুরুষ ব্যক্তি দেখতে না পায়। আর চালকের বেতন হারাম নয়, কেননা মহিলারা তাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখার জন্য এই গাড়ীটি ভাড়া নেয় নি, কিন্তু চালকের ওপর আবশ্যক হলো তাদেরকে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়া; অতঃপর তারা যদি মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতে অস্বীকার করে এবং বারবার তাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখে, তাহলে সে যেন গাড়ীর ভিতরে পর্দার ব্যবস্থা করে। অথবা

পর্দাসম্মত গ্লাস লাগিয়ে নেয় এবং সে যেন তার ও তাদের মাঝখানে আড়াল তৈরি করে নেয়, আর এভাবেই নিষিদ্ধ বিষয় দূর হয়ে যাবে।

শাইখ ইবন 'উসাইমীন

শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য ফাতাওয়া (فتاوى للمدرسين و الطلاب): পৃ. ২৮

(ঈষৎ পরিবর্তিত)

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষক থেকে ছাত্রীদের পর্দা অবলম্বন করা

প্রশ্ন: দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষকদের সামনে মেয়েদের পর্দা না করে জন্য খোলামেলা অবস্থান করা জায়েয (বৈধ) হবে কিনা?

উত্তর: দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পুরুষ ব্যক্তি থেকে নারীর পর্দা করার আবশ্যকতার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেননা এই ব্যাপারে হাদীসের বিভিন্নতা রয়েছে; এক হাদীসের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর অপর এক হাদীসের মধ্যে তার থেকে পর্দা করার অনাবশ্যকতার প্রমাণ রয়েছে।

উম্মু সালামা রা. বর্ণিত হাদীসের মধ্যে আছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে (অন্ধ সাহাবী) ইবন উম্মে মাকতুম রা. থেকে পর্দা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তাঁরা বললেন:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ».

“হে আল্লাহর রাসূল! সে কি অন্ধ নয়, সে তো আমাদেরকে দেখে না এবং আমাদেরকে চিনতেও পারবে না? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্য প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বললেন: তোমারা দু’জনই কি অন্ধ?! তোমরা কি তাকে দেখতে পাও না?!”[13]

সুতরাং এই হাদীসটি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পুরুষ ব্যক্তি থেকে নারীর পর্দা করার আবশ্যকতার ওপর প্রমাণ পেশ করে।

---

[13] আবূ দাউদ, হাদীস নং-৪১১৪

আর ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহ ‘আনহা বর্ণিত হাদীসের মধ্যে আছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহ ‘আনহুর ঘরে ইদ্দত পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

«... فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ».

“...কারণ, সে হলো অন্ধ ব্যক্তি, তুমি তোমার কাপড় টানিয়ে তার থেকে আড়াল করবে।”[14]

আর অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য দলীল (আল্লাহই সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন) হলো, তার উপরে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পুরুষ ব্যক্তি থেকে পর্দা করা আবশ্যক নয়; অর্থাৎ তার উপস্থিতিতে তার (নারীর) চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব নয়; কিন্তু তার (নারীর) জন্য পুরুষ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বৈধ হবে না।

ইমাম শাওকানী রহ. যখন এই হাদীস দু’টি নিয়ে আলোচনা করেন, তখন তিনি বলেন, “জবাবে বলা হয়, হতে পারে তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের নিকট থেকে তাদের দৃষ্টি অবনমিত করার বিষয়টি প্রত্যাশা করেছেন, যাতে ঘরের মধ্যে সমবেত হওয়া এবং দৃষ্টির মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন না হয়।”

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যা রহ. বলেন, “অধিকাংশ আলেমের মতে, নারীর জন্য মূলত অপরিচিত পুরুষদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে অথবা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকানো বৈধ নয়।”

আর এটা এই জন্য যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

[14] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৭৭০

﴿وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ ... ﴾ [النور: ٣١]

“আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনমিত করে ...।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১]

শাইখ আল-ফাওযান

মুসলিম নারীর ফাতাওয়া (فتاوى المرأة المسلمة): ১/২৪৫

শিক্ষার আসরে নারীদের উপস্থিত হওয়া

প্রশ্ন: মুসলিম নারীর জন্য শিক্ষামূলক আসর ও মাসজিদসমূহের মধ্যে ফিকহ শিক্ষার আসরে উপস্থিত জায়েয (বৈধ) হবে কিনা?

উত্তর: হ্যাঁ, নারীর জন্য শিক্ষার আসরসমূহে উপস্থিত হওয়া বৈধ, চাই সেই শিক্ষাটি প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান সংক্রান্ত হউক অথবা আকিদা ও তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) সম্পর্কিত জ্ঞান হউক, তবে শর্ত হলো, সে সুগন্ধি ব্যবহার ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না, আর তার জন্য আরও জরুরি হলো পুরুষদের সাথে না মিশে তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করা। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«... وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا».

“ ... আর নারীদের জন্য উত্তম সারি হলো শেষ সারি, আর তাদের জন্য নিকৃষ্ট সারি হলো প্রথম সারি।”[15] আর এটা এই জন্য যে, তাদের প্রথম সারি পুরুষদের খুব কাছাকাছি তাদের শেষ সারির চেয়ে। ফলে তাদের শেষ সারি তাদের প্রথম সারির চেয়ে উত্তম বলে বিবেচিত হয়েছে।

শাইখ ইবন ‘উসাইমীন

ফাতাওয়া (فتاوى): ২/১২৯

[15] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০১৩

গাড়ীর চালকের সাথে ছাত্রীদের ভ্রমণ

প্রশ্ন: প্রশ্নকারী বলেন, কিছু সংখ্যক মানুষ (আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করুক) তাদের মেয়েদেরকে মাদরাসা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অপরিচিত ড্রাইভারদের সাথে প্রেরণ করেন এবং তারা এই কাজের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করেন না। সুতরাং আমি (আপনাদের নিকট) তাদের উদ্দেশ্যে নসিহত বা উপদেশ কামনা করছি, বিশেষ করে মাদরাসাসমূহ খোলার সময়ের ব্যাপারে?

উত্তর: এই কাজটি দু'ভাবে হতে পারে:

প্রথমত: চালকের সাথে যাত্রী হিসেবে কয়েকজন নারী হওয়া, যেখানে তাদের কেউ একাকী নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় তাতে কোনো সমস্যা নেই, যখন তা শহরের অভ্যন্তরে হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, «لا يخلون رجل بامرأة» "অবশ্যই কোনো একজন পুরুষ একজন নারীকে নিয়ে নির্জনে অবস্থান করবে না", আর এটা নির্জনতা নয়; তবে শর্ত হলো চালকের মধ্যে আমানতদারিতা থাকতে হবে। সুতরাং চালক যদি বিশ্বস্ত না হয়, তবে মহিলাদের সাথে প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান মাহরাম পুরুষ না থাকলে তার সাথে ভ্রমণ করা বৈধ হবে না।

দ্বিতীয়ত: চালক কর্তৃক পৃথকভাবে শুধু একজন মহিলা যাত্রীকে নিয়ে যাওয়া বৈধ হবে না, যদিও তা এক মিনিটের জন্য হউক। কারণ, একাকীভাবে পৃথক হওয়াটাই নির্জনতা, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজ থেকে তাঁর বাণীর মাধ্যমে নিষেধ করেছেন: «لا يخلون رجل بامرأة» "অবশ্যই কোনো একজন পুরুষ একজন

নারীকে নিয়ে নির্জনে অবস্থান করবে না” এবং তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের তৃতীয়জন হলো শয়তান।

আর এর ওপর ভিত্তি করে নারীদের যথাযধ অভিভাবক ও কর্তৃপক্ষের জন্য এই পরিস্থিতিতে তাদেরকে চালকদের সাথে ছেড়ে দেওয়া বৈধ হবে না, যেমনিভাবে নারীর জন্যও তার মাহরাম পুরুষ ছাড়া চালকের সাথে যাত্রী হওয়া বৈধ নয়। কেননা তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতা, যা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলার অবাধ্যতারই নামান্তর। কারণ, কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করলে, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ ﴾ [النساء: ٨٠]

“কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮০]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿... وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا ٣٦ ﴾ [الاحزاب: ٣٦]

“...আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল, সেই ব্যক্তি স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৬]

সুতরাং আমাদের মুসলিম ভাইদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, আমরা আল্লাহর অনুগত বান্দা হব তাঁর নির্দেশ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালন করার মাধ্যমে। যেহেতু এর মধ্যে রয়েছে বড় ধরনের উপকার এবং প্রশংসনীয় ফলাফল, আর আমাদের মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর আবশ্যক হলো, আমরা আমাদের মাহরামা

নারীদের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হব। সুতরাং আমরা তাদেরকে শয়তানের হাতে তুলে দিতে পারি না যে, সে তাদেরকে নিয়ে খেল-তামাশা করবে, অতঃপর সে ফিতনা (বিপর্যয়) ও পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যাবে।

আর আমি আমার ভাইদেরকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আমাদেরকে দুনিয়ার যে চাকচিক্য দিয়েছেন সেটা দ্বারা ধোকাগ্রস্থ হয়ে অবহেলা ও বেপরোয়া আচরণ থেকে সতর্ক করছি, আর আমরা সতর্ক করছি এই আয়াতের কারণে, যাতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَأَصۡحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصۡحَٰبُ ٱلشِّمَالِ ٤١ فِي سَمُومٖ وَحَمِيمٖ ٤٢ وَظِلّٖ مِّن يَحۡمُومٖ ٤٣ لَّا بَارِدٖ وَلَا كَرِيمٍ ٤٤ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَبۡلَ ذَٰلِكَ مُتۡرَفِينَ ٤٥ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ ٤٦﴾ [الواقعة: ٤١، ٤٦]

"আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! তারা থাকবে অত্যন্ত উষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, আর কালো বর্ণের ধূঁয়ার ছায়ায়, যা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়। ইতোপূর্বে তারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে, আর তারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকাজে।" [সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: ৪১-৪৬] আর আমরা অবশ্যই স্মরণ করি আল্লাহ তা'আলা বাণী:

﴿ وَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهۡرِهِۦ ١٠ فَسَوۡفَ يَدۡعُواْ ثُبُورٗا ١١ وَيَصۡلَىٰ سَعِيرًا ١٢ إِنَّهُۥ كَانَ فِيٓ أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورًا ١٣ ﴾ [الانشقاق: ١٠، ١٣]

"আর যাকে তার 'আমলনামা তার পিঠের পিছন দিক থেকে দেওয়া হবে, সে অবশ্যই তার ধ্বংস ডাকবে এবং জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হব।

নিশ্চয় সে তার স্বজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল।” [সূরা আল-ইনশিকাক, আয়াত: ১০-১৩]

শাইখ ইবন ‘উসাইমীন

ফাতাওয়ায়ে মানারুল ইসলাম (فتاوى منار الإسلام): ৩/৮২২

(ঈষৎ পরিবর্তিত)

গাড়ীর চালকের সাথে বুদ্ধিমান শিশুকে সাথে নিয়ে ভ্রমণ করা

প্রশ্ন: আমি গাড়ীর চালকের সাথে সকাল বেলায় মাদরাসায় যাই এবং যোহরের সময় ফিরে আসি এমতাবস্থায় যে, আমার সাথে আমার এমন এক ভাই থাকে, যার বয়স এগার বছরের বেশি নয়। সুতরাং আমার ভাইকে মাহরাম বলে বিবেচনা করা জায়েয (বৈধ) হবে কিনা? আমাকে জানাবেন।

উত্তর: অপরিচিত নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করা থেকে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কেননা উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও অন্যান্য সাহাবীর বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»

“অবশ্যই কোনো একজন পুরুষ একজন নারীকে নিয়ে নির্জনে অবস্থান করবে না, তাহলে তাদের উভয়ের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হবে শয়তান”।

এ জন্য আমরা ফিতনার আশঙ্কায় মুসলিম নারীকে একাকী কোনো অপরিচিত চালকের সাথে গাড়ীর যাত্রী না হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়ে থাকি, সেই চালক যতই বিশ্বস্ত হউক না কেন। কারণ, শয়তান উভয়ের মাঝে কুমন্ত্রণা দিতে পারে, তবে এই ক্ষেত্রে ওলামা ও শাইখদের কেউ কেউ শহরের অভ্যন্তরে প্রসিদ্ধ রাস্তাসমূহে এইভাবে (অপরিচিত চালকের সাথে গাড়ীর যাত্রী হয়ে) চলাচলের অবকাশ দিয়েছেন, যেসব রাস্তা জনমানব শূন্য থাকে না; তাও আবার জরুরি প্রয়োজনের কারণে। যেমন, ইবাদত অথবা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে বাজারে গমন অথবা মাদরাসায় গমন অথবা শরী‘আত স্বীকৃত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ অথবা পরিবার-পরিজন ও

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করা, আর এ ক্ষেত্রে তাকে আরও অবকাশ দেওয়া হয়েছে, যদি তার সাথে বিশ্বস্ত নারীগণ অথবা বুদ্ধিমান মাহরাম পুরুষ থাকে, আর এই ধরনের সকল অবকাশই থাকবে প্রয়োজনের সময়।

শাইখ ইবন জিবরীন

ফায়দা ও ফাতাওয়া (فوائد و فتاوى): পৃ. ১৯৬

শিক্ষিকার সম্মানার্থে ছাত্রীদের দাঁড়ানো

প্রশ্ন: শিক্ষিকার সম্মানার্থে ছাত্রীদের দাঁড়ানোর বিধান কী?

উত্তর: শিক্ষিকার সম্মানার্থে মেয়েদের এবং শিক্ষকের সম্মানার্থে ছেলেদের দাঁড়ানো একটি অনুচিত কাজ এবং তা খুবই অপছন্দনীয় ব্যাপার। কেননা আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "তাঁদের (অর্থাৎ সাহাবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমের) নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ ছিল না অথচ তিনি যখন তাঁদের নিকট উপস্থিত হতেন, তখন তাঁরা তাঁকে সম্মান করার উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন না, কেননা তাঁরা তার অপছন্দনীয় দিক সম্পর্কে জানতেন।" তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار».

"যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার সম্মানে লোকজন দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন জাহান্নামের মধ্যে তার আসন ঠিক করে নেয়।"

আর এই বিষয়ে পুরুষদের হুকুমের মতই নারীদের হুকুম (বিধান)। আল্লাহ সকলকে এমন কাজ করার তাওফীক দিন, যা তিনি পছন্দ করেন; আমাদের সকলকে তাঁর অসন্তুষ্টি ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে রাখুন এবং সকলকে উপকারী ইলম (জ্ঞান) দান করুন ও সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন; তিনি হলেন দানশীল, মাহানুভব।

শাইখ ইবন বায

ফাতাওয়া ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ৪/৩৩৪

পাঠকক্ষে অনুপস্থিত ছাত্রের পক্ষ থেকে হাযিরা দিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন: কোনো কোনো সময় পাঠকক্ষে আমার বন্ধু আমার নিকট আবদার করে সে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আমি যেন তার হাযিরা দিয়ে দেই, যাতে হাযিরা খাতাটি নিয়মিত হয়ে যায়, অতঃপর আমি তার নাম লিখে দেই। সুতরাং এটা কি মানবতার সেবা হিসেবে গণ্য হবে, নাকি তা ধোঁকা ও প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তর: এটা খেদমত, কিন্তু তা হলো শয়তানী খেদমত (সেবা), যে খেদমতে শয়তান তাকে আকৃষ্ট করে, ফলে সে এই ধরনের কাজ করে এবং যে ব্যক্তি উপস্থিত হয় নি, তার হাযিরা দিয়ে দেয়, আর এই কাজের মধ্যে তিনটি সতর্কবাণী বা দৃষ্টি আকর্ষণী রয়েছে:

প্রথম সতর্ক সংকেত: এটা এক ধরনের মিথ্যা। দ্বিতীয় সতর্ক সংকেত: এটা এই বিভাগের কর্তৃপক্ষের সাথে এক ধরনের খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা। তৃতীয় সতর্ক সংকেত: এই ধরনের কাজ অনুপস্থিত ছাত্রকে বৃত্তি বা ভাতা পাওয়ার উপযুক্ত করে, যা তার উপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল, ফলে সে অন্যায়ভাবে তা গ্রহণ ও ভোগ করে। আর এসব সতর্কতামূলক দৃষ্টি আকর্ষণী থেকে যে কোনো একটি কথাই এই ধরনের তৎপরতা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট, যা প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন থেকে স্পষ্ট তা হলো যে এটি মানবিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত; বস্তুত সকল মানবিক বিষয়ই প্রশংসনীয় নয়, বরং তার মধ্যে যা শরী‘আত সমর্থিত, তা প্রশংসনীয়, আর যা শরী‘আত সম্মত নয়, তা নিন্দনীয়। আর বাস্তব কথা হলো, তার পক্ষ থেকে মানবিক কাজ বলে যা বলা হয়, তা যদি শরী‘আত বিরোধী হয়, তবে তা মানবিক কাজ বলে বিবেচিত হবে না।

কারণ, যে কাজটি শরী‘আত বিরোধী, তা পশুসুলভ কাজ বলে বিবেচিত, আর এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা কাফির ও মুশরিকদেরকে পশুর মতো বলে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأۡكُلُونَ كَمَا تَأۡكُلُ ٱلۡأَنۡعَٰمُ وَٱلنَّارُ مَثۡوًى لَّهُمۡ ١٢﴾ [محمد: ١٢]

“আর যারা কুফুরী করেছে, তারা ভোগ বিলাস করে এবং খায় যেমন চতুষ্পদ জন্তুরা খায়, আর জাহান্নামই তাদের নিবাস।” [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১২]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿إِنۡ هُمۡ إِلَّا كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّ سَبِيلًا ٤٤﴾ [الفرقان: 44]

“তারা তো পশুর মতই; বরং তারা আরও অধিক পথভ্রষ্ট।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৪৪] সুতরাং এমন প্রত্যেক কাজ, যা শরী‘আত বিরোধী, তা হচ্ছে পশুসুলভ কর্মকাণ্ড, মানবিক কাজ নয়।

শাইখ ইবন ‘উসাইমীন

ফাতাওয়া ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ৪/৩২৯

পরীক্ষায় নকল করা

প্রশ্ন: পরীক্ষায় নকল করার হুকুম (বিধান) কী?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, আর সালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, আর সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সঙ্গী-সাথীর ওপর।

আমার ধারণা মতে প্রশ্নটির মধ্যেই উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যেহেতু প্রশ্নকর্তা বলেন, পরীক্ষায় নকল (প্রতারণা) করার হুকুম কী? সুতরাং প্রশ্নকর্তা নিজেই স্বীকার করেছেন যে, পরীক্ষায় নকল করাটা এক ধরনের প্রতারণা, আর প্রতারণার বিষয়টি সুস্পষ্ট এবং তার বিধানও স্পষ্ট; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«من غش فليس منا».

“যে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”[16] অতঃপর পরীক্ষায় নকল (প্রতারণা) করা অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তার ক্ষতির দিকটি সম্পদের ক্ষতি বা ঝুঁকির মত নয়, যার কারণে হাদীস বর্ণিত হয়েছে; বরং তার ভয়াবহতা আরও প্রকট, কেননা তা হচ্ছে গোটা জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা। কারণ, যে ছাত্র নকল করে পাশ করেছে, তার মানে হলো: সে যে সার্টিফিকেট (সনদ) অর্জন করেছে, তার মান অনুযায়ী সে একটি বড় ধরণের বলয় তৈরি করবে, অথচ বাস্তবে সে তার উপযুক্ত নয়, আর তখন এই বৃত্ত বা বলয়ের মধ্যে

[16] তিরমিযী, হাদীস নং ১৩১৫

তার অবস্থান এমন হবে, যেই অবস্থানটি এই সার্টিফিকেট অর্জন করা ব্যতীত কোনো ব্যক্তির পক্ষে দখল করা সম্ভব নয়, ফলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হলো; এই নকল প্রবণতার আরও একটি ক্ষতিকর দিক আছে, আর তা হলো শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কারণ, যখন জাতির শিক্ষিত সমাজ পরীক্ষায় নকল বা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে পাশ করে বের হয়ে আসবে, তখন তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থান হবে নড়বড়ে, শিক্ষা বিমুখ। অতঃপর (শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে) অন্যের ওপর তাদের অবস্থান হবে রিক্তহস্ত। কারণ, এটা জানা কথা যে, যে ব্যক্তি পরীক্ষায় নকল করে পাশ করে, তার পক্ষে শিক্ষা দানের সময় ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। সুতরাং রাষ্ট্রের সাথে এই ধরনের প্রতারণা করা থেকে বিরত থাক, যা তুমি নিজেও কখনও পছন্দ করবে না; অতএব পরিদর্শক, পর্যবেক্ষক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে এই নকল প্রবণতা প্রতিরোধে নিরন্তর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ, কোনো একজন যদি প্রতারণা করে, তবে সেই প্রতারক রাষ্ট্র বা সরকারের লক্ষ্যমাত্রা বিনষ্ট করবে এবং তার (রাষ্ট্রের) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ٢٨﴾ [الانفال: ٢٧، ٢٨]

"হে ঈমানদারগণ! জেনে-বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খেয়ানত করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতেরও খেয়ানত করো না, আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা।

আর নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। [সূরা আল-আনাফাল, আয়াত: ২৭, ২৮]

আর এই ব্যাপারে কোনো এক বিষয় থেকে অপর কোনো বিষয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ তাফসীর বিষয় ও ইংরেজি ভাষা বিষয়ে আমাদের নকল করার মধ্যে বিধানগত কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে ছাত্রের অগ্রগতি হওয়ার বিষয়টি বিন্যস্ত হয় সকল বিষয়ের ওপর এবং তার ওপরই নির্ভর করে ছাত্রকে সার্টিফিকেটের মত প্রমাণপত্র দেওয়ার বিষয়টি। সুতরাং সবই প্রতারণা, আর সবই হারাম। আর আমি আমাদের যুবকদেরকে তাদের এই পর্যায়ের অধঃপতন হওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তাদেরকে আহ্বান করছি, তারা যাতে যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে মর্যাদা লাভের ব্যাপারে প্রচণ্ড আগ্রহী হয়। ফলে এটা তাদের দীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

শাইখ ইবন ‘উসাইমীন

ফাতাওয়া ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ৪/৩৩১

পরীক্ষায় নকল করার প্রতি শিক্ষকের সম্মতি

প্রশ্ন: শিক্ষাবিষয়ক পরীক্ষাসমূহের মধ্যে নকল করার হুকুম (বিধান) কী হবে, যখন শিক্ষকের এই বিষয়টি জানা থাকে?

উত্তর: সকল প্রকার পরীক্ষার মধ্যে নকল বা প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হারাম, যেমনিভাবে তা হারাম যাবতীয় আচার-আচরণ ও লেনদেনের মধ্যে। সুতরাং কোনো ব্যক্তির জন্য পরীক্ষাসমূহের মধ্যে কোনো বিষয়ে নকল বা প্রতারণার আশ্রয় নেয়া বৈধ নয়, আর যখন কোনো শিক্ষক এই ধরনের নকল প্রবণতার প্রতি সমর্থন বা সম্মতি প্রদান করবে, তখন সে অন্যায় ও খেয়ানতের (বিশ্বাসঘাতকতার) মত অপরাধের অংশীদার হবে। আর সাহায্য চাওয়ার জায়গা তো একমাত্র আল্লাহই।

শাইখ ইবন বায

মাজমু‘উ ফাতাওয়া (مجموع فتاوى)ফাতওয়া আকীদা: ৩/১১৬৬

(ঈষৎ পরিবর্তিত)

অকৃতকার্যতা কি পরীক্ষায় নকল প্রবণতাকে অনুমোদন করে?

প্রশ্ন: আমি এমন মানুষ, যার নিকট পড়ালেখা খুব জটিল ও দুর্বোধ্য, আমি খুব কমই বুঝতে পাড়ি, যার কারণে আমি পরীক্ষায় নকল করি, আশা করি আমাকে বিষয়টি অবগত করবেন?!

উত্তর: আমরা তোমাকে ভালোভাবে চেষ্টা ও প্রচেষ্টা, নিয়মিত অধ্যয়ন, মুখস্থকরণের ব্যাপারে একাগ্রতা, অনুধাবন করা, শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট থেকে সহযোগিতা গ্রহণ, বারবার অধ্যয়ন ও পাঠ করাসহ ইত্যাদি বিষয়ের উপদেশ দিচ্ছি, যা ফায়দা (উপকার) হাসিল, অর্থ অনুধাবন এবং পরীক্ষায় নকলের ব্যবহার পরিত্যাগে অন্যতম ভূমিকা রাখবে, কারণ নকল হারাম এবং জাতির সাথে বিশেষ ও সাধারণভাবে এক ধরনের প্রতারণা।

শাইখ ইবন জিবরীন

ফাতাওয়া ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): **১/১৭৯**

যে ব্যক্তি পরীক্ষায় নকল করে সার্টিফিকেট (সনদ) অর্জন করেছে, তার চাকুরির বিধান

প্রশ্ন: কোনো এক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় সার্টিফিকেট (সনদ) অর্জন করেছে এবং শিক্ষার যেসব স্তর সে অতিক্রম করেছে, সেসব স্তরের মধ্যে কখনও কখনও নকল কপি বহন অথবা তার বন্ধু-বান্ধবদের নিকট থেকে সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতারণার পথ অবলম্বন করেছে, আর পাশ করে বের হওয়ার পর সে তার অর্জিত সার্টিফিকেট অনুযায়ী কোনো এক দফতরে চাকুরীতে নিয়োগ পেয়েছে এবং এর বিনিময়ে মাসিক বেতন-ভাতা গ্রহণ করছে। সুতরাং এই অবস্থায় তার এই বেতন-ভাতা হালাল হবে, নাকি হারাম হবে। জেনে রাখা দরকার যে, সে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, বরং বিশেষ সময়ে তার (অর্পিত দায়িত্বের) চেয়ে অধিক দায়িত্ব পালন করে। সুতরাং যখন এই অর্জিত বস্তুটি (সনদ) হারাম হয়, তখন উৎপত্তিস্থলের বিধান কী হবে, আমাদেরকে সমাধানমূলক ফাতওয়া দিন?

উত্তর: তার ওপর আবশ্যক হলো, সে যে কাজ করেছে, তার জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং লজ্জিত হওয়া, আর চাকুরীটি বিশুদ্ধ এবং তার থেকে যা উপার্জন করেছে তাও শুদ্ধ, যতক্ষণ সে তার ওপর দেওয়া দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে; আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য); কিন্তু আমরা যেমন বললাম: তার ওপর আবশ্যক হলো এই অসৎ ও মন্দ কর্ম থেকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা এবং তার পূর্বের কৃত এই ধরনের অসৎ ও মন্দ কর্ম থেকে তাওবা করা ও অনুতপ্ত হওয়া।

শাইখ ইবন বায:

মাজমু‘উ ফাতাওয়া (مجموع فتاوى): ৪/৩০১

পরীক্ষায় অকৃতকার্যতায় ধৈর্যধারণ করা

প্রশ্ন: আমি সতের বছর বয়সের যুবক, আমার নিকট গণিত বিষয়ে অধ্যয়ন করাটা খুবই কষ্টকর, এমনকি গত বছর আমি এই বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছি, জানা থাকা দরকার যে, আমি বাকি বিষয়সমূহ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে খুবই ভালো; আমি আশা করি আপনি এর ওপর আলোকপাত করবেন, তবে জেনে রাখা দরকার যে, কোনো কোনো যুবক এই কারণে তার পড়ালেখা ছেড়ে দেয়?

উত্তর: এই গণিত বিষয়টির ব্যাপারে (কর্তৃপক্ষের) বিশেষ নজর দেওয়া উচিৎ। এই বিষয়টি কি ছাত্রদের মানের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে, নাকি ছাত্রদের মানের চেয়ে আরও উন্নত স্তরের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে, আর এই ক্ষেত্রে সকল ছাত্রের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আসতে হবে, আর সিলেবাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাধারণত অন্যান্য ছাত্রের চেয়ে নিম্নমানের বা কম সংখ্যক ছাত্রের মানের দিকে লক্ষ্য করা হয় না, বরং লক্ষ্য করা হয় অধিকাংশ ছাত্রের মানের দিকে। সুতরাং অধিকাংশ ছাত্র যখন তা আত্মস্থ করতে সক্ষম হয় এবং তাতে ভালো করে, তখন তাকে সকল ছাত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর পাঠ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়; তবে অধিকাংশ ছাত্র যখন তাতে ভালো করতে পারে না এবং তা হজম করতে সক্ষম হয় না, তখন কর্তৃপক্ষের জন্য উচিৎ হবে তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। আর তোমার ব্যাপারে কথা হলো, তুমি তো শুধু এই বছরে তাতে অকৃতকার্য হয়েছে। সুতরাং এক বছরের জন্য এই ধরনের একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ার কারণে বিষয়টি জটিল বলে গণ্য করা যায় না, আর তোমার জন্য যা করা উচিৎ, তা হলো: তুমি বিষয়টিকে জটিল মনে

করবে না এবং তুমি তোমার চারপাশে যার অবস্থান করে, তাদের মধ্যে যারা দুই বিষয় বা তার অধিক সংখ্যক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে অথবা যারা দুই বছর বা তার অধিক সময় ধরে অকৃতকার্য হচ্ছে, তাদের প্রতি দৃষ্টি দেবে, শেষ পর্যন্ত তোমার নিকট ব্যাপারটি সহজ মনে হবে; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের দিকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, তিনি বলেছেন:

«انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ».

“তোমরা তোমাদের চেয়ে নীচু মানের লোকজনের প্রতি লক্ষ্য কর, আর তোমাদের চেয়ে উঁচু মানের লোকজনের প্রতি লক্ষ্য কর। কারণ, তোমাদের ওপর আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতকে তুচ্ছ মনে করার চেয়ে এটাই হলো যথাযথ পদক্ষেপ।” সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬১৯)।

শাইখ ইবন ‘উসাইমীন

ফাতাওয়ায়ে মানারুল ইসলাম (فتاوى منار الإسلام): ৩/৬৯৭

(ঈষৎ পরিবর্তিত)

পিতা-মাতা কর্তৃক তাদের সন্তানের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা

প্রশ্ন: আমি পনের বছরের যুবক, কিন্তু আমি একটা সমস্যার শিকার, তা হচ্ছে আমার পিতা ও মাতা যখন স্বচক্ষে আমাকে দেখতে আসে এমন অবস্থায় যে আমি তখন অধ্যয়নরত ছিলাম না, ফলে তারা আমাকে বলে: নিশ্চয়ই তুমি পড়ালেখা কর না, অথচ আমি পড়ালেখা করি, আর তারা উভয়ে আমাকে খারাপ মনে করে, অথচ আমি তার কারণ জানি না এবং আমার পক্ষ থেকে কোনো বিষয়টি তারা শুনলে বিশ্বাস করবে, তাও বুঝতে পারছি না। সুতরাং আমি কী করব?

উত্তর: এই সমস্যার সমাধান তো খুব সহজ ইনশাআল্লাহ, আর তা হলো, তুমি এটা প্রমাণ করবে তোমার পিতাকে মাদরাসায় (বিদ্যালয়ে) নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে, যাতে তিনি স্বয়ং নিজেই সরেজমিনে বিষয়টি জেনে আসতে পারেন অথবা মাদরাসা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে এমন প্রমাণপত্র দাবি করবে, যা প্রমাণ করবে যে, তুমি ছাত্র এবং ঐ শ্রেণীর ছাত্র, যাতে তুমি পড়ালেখা কর, আর তাতে মাদরাসার প্রধান স্বাক্ষর করে দেবেন এবং প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর লাগিয়ে দেবেন।

আর পিতা-মাতার জন্যও উচিৎ কাজ হবে না যে, তাদের নিকট যা কিছু বলা হবে, তাই বিশ্বাস করবে; বরং তাদের উচিৎ হলো প্রতিটি বিষয়কে তার জায়াগায় স্থান করে দেওয়া। সুতরাং তোমার ব্যাপারে যা বলা হবে, তুমি যখন সেই অভিযোগে অভিযুক্ত নও, তখন তোমার ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে খারাপ ধারণা পোষণ করা উচিৎ নয়। কারণ, খারাপ ধারণার জন্যও একটা যুক্তিযুক্ত পাত্র আছে; অথচ তুমি যখন অসুস্থ অবস্থায় ছিলে, তখন তাদের জন্য তোমার ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা

বৈধ নয়, আর আমরা আল্লাহর নিকট তোমার জন্য অটল মনোবল ও দৃঢ়চিত্তের আবেদন করি এবং তোমার পিতা-মাতার জন্য প্রার্থনা করি হিদায়াত ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির। আর আল্লাহই হলেন তাওফীক দানকারী।

শাইখ ইবন 'উসাইমীন

ফাতাওয়ায়ে মানারুল ইসলাম (فتاوى منار الإسلام): ৩/৭২৬

মাতা কর্তৃক তার সন্তানদেরকে বদদো'আ করা

প্রশ্ন: জনৈক মহিলা বলেন, আমার একটা সমস্যা আছে, আর তা হলো- আমার পাঁচটি কন্যা সন্তান ও তিনটি ছেলে সন্তান আছে, তাদের মধ্যে কিছু বিবাহিত, আবার কিছু মাদরাসার ছাত্র; কিন্তু তারা পড়ালেখার সাথে তাল মিলাতে না পেরে পড়াশুনা বাদ দিয়ে দিয়েছে, আর আমার সবগুলো ছেলের মধ্যে বড় রকমের বিরোধ রয়েছে, তারা কেউ কারও সাথে কথা বলে না এবং একে অপরকে ঘৃণা করে, আর তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকিরা সালাত আদায় করে না, আর আমি আমার মন থেকে তাদের জন্য বদদো'আ করি, এমনকি সালাতের মধ্যে পর্যন্ত। সুতরাং আমি তাদের সাথে কী আচরণ করব, সেই ব্যাপারে আমাকে দিকনির্দেশনা প্রদান করুন? আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

উত্তর: আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে আমর মন চাচ্ছে ঐসব ছেলেদের প্রতি উপদেশ বা নসিহত পেশ করি, যাতে তারা তাদের পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করে, আর তারা তাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু করবে। সুতরাং তারা যখন এই কাজটি করবে, তখন আল্লাহ তাদের জন্য সকল বিষয় সহজ করে দেবেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿...وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُ...﴾ [الطلاق: ٢، ٣]

“... আর যে কেউ আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ বের করে দেবেন এবং তিনি তাকে তার ধারণাতীত

উৎস থেকে রিযিক দান করবেন; ...।” [সূরা আত-ত্বালাক: ২, ৩] আর যখন তারা এই কাজটি করবে, তখন তাদের হৃদয় খুলে যাবে, তাদের মন প্রশান্তি অনুভব করবে এবং তাদের অস্থিরতা, আত্মার সংকীর্ণতা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা দূর হবে, আর তারা উপলব্ধি করবে যে, তারা প্রকৃতভাবে জীবনযাপন করছে।

আর যখন তাদের হৃদয়-মন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং আল্লাহর আনুগত্য করা থেকে দূরে সরে যাবে (না'উযুবিল্লাহ), তখনই তার সাথে অস্থিরতা ও অবস্থার সংকীর্ণতা যোগ হয়ে যাবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তাদের ওপর দুনিয়ার অবস্থা এমন হবে যে, মনে হবে তারা যেন কাঁচের ঘরে অবস্থান করছে; আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرۡتَنِيٓ أَعۡمَىٰ وَقَدۡ كُنتُ بَصِيرٗا ١٢٥ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتۡكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَاۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمَ تُنسَىٰ ١٢٦ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي مَنۡ أَسۡرَفَ وَلَمۡ يُؤۡمِنۢ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦۚ وَلَعَذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبۡقَىٰٓ ١٢٧﴾ [طه: ١٢٤، ١٢٧]

“আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমরা তাকে কিয়ামতের দিন জমায়েত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, ‘হে আমার রব! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় জমায়েত করলেন? অথচ আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান। তিনি বলবেন, ‘এরূপই আমাদের নিদর্শনাবলী তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ছেড়ে দিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তোমাকেও (জাহান্নামে) ছেড়ে রাখা হবে। আর এভাবেই আমরা প্রতিফল দেই তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে

ও তার রবের নিদর্শনে ঈমান না আনে। আর আখেরাতের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিক স্থায়ী।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১২৪-১২৭]

আর আপনার প্রশ্নের ব্যাপারে কথা হলো, আপনার পক্ষ থেকে যা হয়েছে, তা ছিল ভুল, আর তা হলো, তাদের জন্য বদ-দো‘আ করা। সুতরাং আপনার জন্য উচিৎ হলো, আপনি আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করবেন, তিনি যেন তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, তাদেরকে হকের (সত্যের) দিকে ফিরিয়ে দেন এবং তাদেরকে সংশোধন করে দেন, আর তা‘আলার হাতে আকাশমণ্ডলী ও জমিনের নিয়ন্ত্রণ, আর তিনি এসব অবাধ্য জাতিকে সঠিক পথের অনুসারী জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম।

সুতরাং আপনার উদ্দেশ্যে আমার পরামর্শ হলো, আপনি তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট সালাতের মধ্যে সাজদাহ’য় গিয়ে, শেষ তাশাহুদের মধ্যে, আযান ও ইকামতের মধ্যকার সময়ে এবং রাতের শেষ অংশে দো‘আ করবেন, আর প্রতিটি উপযুক্ত সময়ে আপনি আল্লাহ তা‘আলার নিকট তাদের জন্য হিদায়াত ও তাওফীক চেয়ে প্রার্থনা করবেন, আর আপনি দো‘আ কবুলের প্রত্যয় নিয়ে আল্লাহ তা‘আলার নিকট তাদের জন্য প্রার্থনা করবেন। কেননা আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। সুতরাং হয়তো আল্লাহ আপনার দো‘আ কবুল করবেন; ফলে তা হবে তাদের জন্য যথাযথ এবং আপনার জন্য হবে দুনিয়া ও আখিরাতে চোখের প্রশান্তি। আর আল্লাহই হলেন তাওফীক দানকারী।

শাইখ ইবন ‘উসাইমীন: ফাতাওয়া মানারুল ইসলাম (فتاوى منار الإسلام): ৩/৭২৫। ঈষৎ পরিবর্তিত

ছাত্রীগণ কর্তৃক শিক্ষিকাদের সাথে উপহাস করা

প্রশ্ন: ছাত্রীদের কেউ কেউ শিক্ষিকাদের সাথে উপহাস করে এবং তাদেরকে মন্দ বা হাস্যকর উপাধি দ্বারা ডাকাডাকি করে, আর তারা বলে যে, আক্ষরিক অর্থে তাদেরকে এই নামে ডাকা হয় না, বরং এমনটি করা হয় শুধু রসিকতার ছলে?

উত্তর: মুসলিম ব্যক্তির জন্য অবশ্যই করণীয় কাজ হলো তার জিহ্বাকে এমন কথা বলা থেকে হিফাযত করা, যা অপর মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয় অথবা তাদের সম্মানহানি করে। কারণ, হাদীসের মধ্যে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم».

“তোমরা মুসলিমদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে দোষারোপ করো না এবং তাদের গোপন বিষয়ের অনুসরণ করো না।”[17] আর আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ ١﴾ [الهمزة: ١]

“দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে।” [সূরা আল-হুমাযাহ, আয়াত: ১]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ هَمَّازٖ مَّشَّآءِۢ بِنَمِيمٖ ١١﴾ [القلم: ١١]

“পিছনে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়।” [সূরা আল-কলম: ১১]

---

[17] আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবন মাজাহ

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ ﴾ [الحجرات: ١١]

“আর তোমরা একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না ...।” [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১১] সুতরাং মুসলিম ব্যক্তির মানহানি করা এবং তাকে কষ্ট দেওয়া হারাম; যদি সে রসিকতার ছলে এই ধরনের কথা বলে, তবে সে এটাকে ওযর হিসেবে পেশ করতে পারবে না ঐ ব্যক্তিদের মত, যারা বলে:

﴿... إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلۡعَبُۚ ...﴾ [التوبة: ٦٥]

“আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম।” [সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৬৫]

শাইখ ইবন জিবরীন

ফায়দা ও ফাতাওয়া (فوائد و فتاوى): পৃ. ১০৮

আবাসিক হলের মধ্যস্থিত অশ্লীলতা

প্রশ্ন: আমি একজন তরুণী, আমি আবাসিক হলে অন্যান্য ছাত্রীদের সাথে বসবাস করি, আল্লাহ আমাকে হক (সত্য) পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং আমি তাঁকে (তাঁর বিধানকে) আঁকড়ে ধরেছি, আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত ... কিন্তু আমি আমার চারপাশে, বিশেষ করে আমার ছাত্রী বান্ধবীদের পক্ষ থেকে যে অন্যায় ও অশ্লীলতা লক্ষ্য করি, তাতে আমি খুবই বিরক্তিবোধ করি, যেমন, গান শোনা, গীবত (পরনিন্দা), কুৎসা রটনা ইত্যাদি; অথচ আমি তাদেরকে অনেক উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু তাদের কেউ কেউ আমার সাথে উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং তারা বলে: আমি নাকি কুটিল ... সম্মানিত শাইখ, আমি আপনার নিকট জানতে চাচ্ছি যে, এই অবস্থায় আমি কী করব? আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

উত্তর: এই অবস্থায় তোমার আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো, তোমার সাধ্য অনুসারে উত্তম কথা, হৃদ্যতা, সুন্দর আচরণ ও উত্তম পন্থায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করা এবং তার সাথে সাথে তোমার জ্ঞান অনুযায়ী এই প্রসঙ্গে বর্ণিত আল-কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, আর গানবাদ্য ও অন্যান্য হারাম কথা ও কাজের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগী না হওয়া এবং যথাসম্ভব তাদেরকে এড়িয়ে চলা যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গ শুরু করে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ٦٨﴾

[الانعام: ٦٨]

“আর আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, যারা আমাদের আয়াতসমূহ সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গ শুরু করে। আর শয়তান যদি আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবেন না।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৬৮] আর যখন তুমি তোমার সাধ্য অনুসারে মৌখিকভাবে প্রতিবাদ করবে এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে পরিহার করে চলবে, তখন তাদের কর্মকাণ্ড ও দোষত্রুটি তোমাকে ক্ষতি করতে পারবে না, যেমনটি তা‘আলা বলেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥﴾ [المائدة: ١٠٥]

“হে মুমিনগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই ওপর। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন; তারপর তোমরা যা করতে, তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ১০৫] সুতরাং তা‘আলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, পথভ্রষ্ট ব্যক্তি মুমিন ব্যক্তির কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যখন সে সত্যকে তার নিত্য সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করবে এবং সঠিক পথের ওপর অটল থাকবে, আর এটা সম্ভব হবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, সত্যের ওপর অটল থাকা ও তার (হকের) দিকে সর্বোত্তম পন্থায় দা‘ওয়াত তথা আহ্বান করার মাধ্যমে, আর অচিরেই আল্লাহ তোমার জন্য (সংকট উত্তরণের) উপায় ও পথ বের করে দেবেন এবং আল্লাহ তোমার দিকনির্দেশনার মাধ্যমে তাদেরকে উপকৃত করবেন, যখন

তুমি ধৈর্যধারণ ও সাওয়াবের আশা করবে- ইনশাআল্লাহ, আর তুমি মহান কল্যাণ ও প্রশংসনীয় পরিণামের সুসংবাদ গ্রহণ করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি হকের (সত্যের) ওপর অটল থাকবে এবং তার বিরুদ্ধাচরণকারীর ব্যাপারে প্রতিবাদী হবে, যেমনটি তা'আলা বলেছেন:

﴿ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ ١٢٨ ﴾ [الاعراف: ١٢٨]

"আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১২৮]

তা'আলা আরও বলেছেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٦٩ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]

"আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমাদের পথসমূহের হিদায়াত দিব। আর নিশ্চয় আল্লাহ মুহসিনদের সঙ্গে আছেন।" [সূরা আল-'আনকাবুত, আয়াত: ৬৯]

আল্লাহ তোমাকে এমন বিষয় বা কাজকর্মের তাওফীক দান করুন, যা তিনি পছন্দ করেন এবং তোমাকে ধৈর্য ও দৃঢ়তা দান করুন, আর তিনি তোমার বোন, পরিবার-পরিজন ও বান্ধবীদেরকেও এমন বিষয় বা কাজকর্মের তাওফীক দান করুন, যা তিনি পছন্দ করেন, আর তিনি বিশেষভাবে শ্রবণকারী, খুবই নিকটবর্তী, আর তিনি হলেন সঠিক পথের পথপ্রদর্শক।

শাইখ ইবন বায

নারী বিষয়ক ফাতাওয়া (فتاوى المرأة): পৃ. ২০১

প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র চুরি করা

প্রশ্ন: আমি মাধ্যমিক স্তরের একজন ছাত্র, তবে আমি প্রাথমিক স্তরে অধ্যয়নকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের কিছু বই ও আসবাবপত্র চুরি করেছিলাম, এখন আল্লাহ আমাকে হিদায়াত (সঠিক জ্ঞান) দান করেছেন ... সুতরাং এখন আমি কী করব, আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো রোগ নাযিল করেন নি, যার চিকিৎসা বা ঔষধ তিনি নাযিল করেন নি ... আর এই রোগটি অধিকাংশ মানুষের ছোট বেলায় হয়ে থাকে এবং যুবক অবস্থায় তার প্রতিকার হয়ে যায় ... সুতরাং যখন তুমি কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে অথবা কোনোভাবে কিছু চুরি করবে, তখন তোমার ওপর আবশ্যক হলো, তুমি যার কাছ থেকে চুরি করেছ, তার সাথে যোগাযোগ করবে ও তার কাছে তা পৌঁছিয়ে দেবে এবং বলবে: আমার নিকট আপনার এই এই জিনিস রয়েছে, অতঃপর তোমাদের উভয়ের মাঝে একটি সংশোধনমূলক সমাধানে পৌঁছাবে। কিন্তু কখনও কখনও মানুষ এটাকে তার ওপর কষ্টকর কাজ মনে করে। যেমন, তার পক্ষে কোনো ব্যক্তির নিকট যাওয়া এবং তাকে এই কথা সম্ভব হয়ে উঠে না যে, আমি আপনার নিকট থেকে এই এই জিনিস চুরি করেছি এবং আপনার নিকট থেকে এই এই জিনিস গ্রহণ করেছি। সুতরাং এই অবস্থায় তোমার পক্ষে ভিন্ন পন্থায় পরোক্ষভাবে এসব দিরহাম বা টাকা-পয়সার মতো জিনিস তার কাছে পৌঁছানো সম্ভব। যেমন, সে তা ঐ ব্যক্তির কোনো এক বন্ধুর নিকট দিয়ে দেবে এবং বলবে, এই জিনিসটি অমুক ব্যক্তির, আর সে তার নিকট

তার ঘটনাটি খুলে বর্ণনা করবে এবং বলবে, আমি এখন তাওবা করে আল্লাহ তা‘আলার দিকে ফিরে এসেছি। সুতরাং আমি আশা করি আপনি জিনিসটি তার কাছে পৌঁছিয়ে দেবেন ... আর যখন সে এই কাজ করবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿... وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ ...﴾ [الطلاق: ٢]

“... আর যে কেউ আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ বের করে দেবেন ...।” [সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ২] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤ ﴾ [الطلاق: ٤]

“আর যে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।” [সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ৪] সুতরাং কাজটি সহজ হয়ে যাবে ...

আর যখন বুঝা যাবে যে, তুমি যেই ব্যক্তির নিকট থেকে চুরি করেছে, এখন তুমি তাকে চিনতে পারছ না বা তার ব্যাপারে জান না এবং সে কোথায় আছে তাও জান না, তাহলে এটা প্রথমটির চেয়ে আরও সহজ। কারণ, তুমি যা চুরি করেছ, তার দ্বারা এই নিয়তে সাদকা করে দেওয়া সম্ভব যে, এটার সাওয়াব তার মালিকের জন্য, আর তখন তুমি তার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

নিশ্চয়ই প্রশ্নকর্তা যেই কাহিনী উল্লেখ করেছে, তা মানুষের জন্য আবশ্যক করে যে, সে এই ধরনের কাজ থেকে দূরে থাকবে। কারণ, তা বিবেকশূন্য ও নির্বোধ অবস্থায় কোনো কোনো সময় হতে পারে; ফলে সে চুরি করে এবং চুরিকে সে তেমন কিছু মনে করে না, অতঃপর

যখন আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত তথা সঠিক পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে তার ওপর অনুগ্রহ করেছেন, তখন এর থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে সে অনেক কষ্ট-কসরত করে।

শাইখ ইবন 'উসাইমীন

ফাতাওয়া ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ৪/১৬২

ডাইনিং রুমে ছাত্রদের কতিপয় অপরাধ

প্রশ্ন: আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, কোনো কোনো ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইনিং রুমে তাদের জন্য যেই খাবার বরাদ্দ আছে, তার চেয়ে অধিক পরিমাণ খাবার গ্রহণ করে। যেমন, বরাদ্দ আছে চার প্রকার খাবার, অথচ পৃথকভাবে কোনো মূল্য পরিশোধ করা ছাড়াই পাঁচ রকম খাবার গ্রহণ করা। অনুরূপভাবে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, কোনো কোনো ছাত্র সাধারণ হলোরুমের পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এগুলো তারা তাদের নিজেদের রুমের জন্য নিয়ে যায়, অথচ এগুলো রাখা হয়েছে সকলের জন্য। সুতরাং এর বিধান কী হবে?

উত্তর: এই দুইটি কাজের কোনোটিই বৈধ নয়; প্রথমটি অবৈধ হওয়ার কারণ হলো, যেহেতু সে তার জন্য বরাদ্দকৃত খাবারের চেয়ে এক প্রকারের খাবার অতিরিক্ত হিসেবে গ্রহণ করেছে, সেহেতু অতিরিক্ত খাবারটি তার জন্য হারাম হয়ে গেল। কেননা সে অবৈধ পন্থায় সম্পদ ভোগ করেছে; তবে সে যদি তার মূল্য পরিশোধ করে অথবা ছাত্রদের খাবার সরবরাহের দায়িত্বে যিনি আছেন, তার থেকে অনুমতি নেয় অথবা এই বিষয়ে জানানোর পর সে যদি তা মেনে নেয়, তাহলে তা বৈধ হবে। কেননা এটা তার হক (অধিকার)। আর দ্বিতীয় মাসআলা: তা হলো বস্তুটি একচেটিয়া নিজের দখলে নিয়ে যাওয়া, যার মধ্যে তার এবং অন্যদের অধিকার রয়েছে। সুতরাং এটা বৈধ নয়, তবে সেখানে যদি ধারাবাহিকতার বিন্যাস থাকে। যেমন, কেউ যদি লাইব্রেরি থেকে একটি বই কয়েকদিন পাঠ করার জন্য ধার হিসেবে গ্রহণ করে, অতঃপর সে

তা ফেরত দিয়ে দেবে এই শর্তে, তাহলে তাতে দোষের কিছু নেই। কেননা সে তা শরী'আত সম্মত পন্থায় গ্রহণ করেছে।

শাইখ ইবন 'উসাইমীন

ফাতওয়ায়ে ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ৪/৩২৯

ভয়ভীতি ও বিরক্তিকর স্বপ্ন

প্রশ্ন: আমি ষোল বছর বয়সের ছাত্র; আমার একটি সমস্যা আছে, যা আমাকে অশান্ত করে তোলে, আর তা হলো- আমি খুব ভয় পাই, এমনকি আমি যদি আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যেও অবস্থান করি, আর আমার এই ভয়ের কারণ হলো, আমি মনে মনে অনেক কিছু ভাবি এবং কল্পনা করি, আর যখন রাতের আগমন ঘটে, তখন আমার ভয় আরও প্রকট হতে থাকে। সুতরাং বিরক্তিকর ও ভীতিকর স্বপ্নের আধিক্যতার কারণে আমার ঘুমে স্বস্তিবোধ করতে পারি না। তবে আমি আল্লাহকে স্মরণ করি এবং তার নিকট আশ্রয় চাই; এ সত্ত্বেও ভয় আমার পিছু ছাড়ছে না। আমি আপনাদের নিকট দিকনির্দেশনা কামনা করছি; আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন?

উত্তর: কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষ ভয়, ভীতি ও শঙ্কা দ্বারা আক্রান্ত হয়; কখনও আক্রান্ত হয় বাস্তব জিনিসের কারণে, তখন সে যদি তার মোকাবিলায় ভীরুতার পরিচয় দেয়, তাহলে সে তা থেকে মুক্ত হতে পারবে না অথবা সে এই ভয়ানক পরিস্থিতির শিকার হয় শয়তান তার অন্তরে যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়, তার কারণে; কিন্তু আল-হামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) এর নিরাময় হলো, সে আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখবে, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তাঁর ওপর ভরসা করবে, আর এটা এইভাবে যে, তুমি তোমার সকল বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলার ওপর নির্ভর করবে এবং বর্ণিত দো‘আসমূহ পাঠ করার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। যেমন, আয়াতুল কুরসী পাঠ করা; আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥﴾ [البقرة: ٢٥٥]

“আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে, তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর ‘কুরসী’ আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে, আর এ দু’টোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৫] কেননা, যে ব্যক্তি রাতের বেলায় তা পাঠ করবে, তার ওপর সার্বক্ষণিক আল্লাহর পক্ষ থেকে পাহরাদার নিযুক্ত থাকে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তার নিকটবর্তী হতে পারে না।

অনুরূপভাবে সূরা আল-বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করা; আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨٥ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا

حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦﴾ [البقرة: ٢٨٥، ٢٨٦]

“রাসূল তার প্রভুর পক্ষ থেকে যা তার কাছে নাযিল করা হয়েছে তার ওপর ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের ওপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে: আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব! আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল। আল্লাহ কারও ওপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে ভালো যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই, আর মন্দ যা কামাই করে তার প্রতিফল তার ওপরই বর্তায়। ‘হে আমাদের রব! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর যেমন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, আমাদের ওপর তেমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ আমাদের নেই। আর আপনি আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৫, ২৮৬] কারণ, যে ব্যক্তি রাতের বেলায় এই দু’টি আয়াত পাঠ করবে, তাহলে তা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

আর এই জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো দো‘আ হচ্ছে:

«اللَّهُمَّ أني أعوذ بك من الهم والحزن».

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা ও অতীতের দুশ্চিন্তা থেকে আশ্রয় চাই।”[18] সুতরাং "الهم" শব্দের অর্থ: ভবিষ্যতের বিষয়ে দুশ্চিন্তা করা, আর الحزن শব্দের অর্থ: অতীতে ঘটে যাওয়া বিষয়ে দুশ্চিন্তা করা।

শাইখ ইবন ‘উসাইমীন

ফাতাওয়া মানারুল ইসলাম (فتاوى منار الإسلام): ৩/৭০৫

[18] ইমাম তিরমিযী তার ‘আস-সুনান’ গ্রন্থে হাদীসখানা বর্ণনা করেন, হাদীস নং ৩৪৮৪

মেয়েদের শিক্ষার জন্য সীমারেখা আছে কি?

প্রশ্ন: সম্মানিত শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম রহ.-কে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তার কোনো নির্ধারিত সীমারেখা আছে কিনা? সে কত বছর বয়সে উন্নীত হলে তার পড়ালেখা থেকে বিরত থাকবে?

উত্তর: শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম রহ. জবাবে বলেন, শিক্ষার জন্য তা শুরু করার ক্ষেত্রে যেমন কোনো নির্ধারিত সীমারেখা নেই এবং তা শেষ কারার ক্ষেত্রেও কোনো নির্ধারিত সীমারেখা নেই। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মেয়েরা তাদের পড়ালেখা থেকে উপকারী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে উপকৃত হবে এবং তার সাথে কোনো প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয়ের উদ্ভব হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত পড়ালেখা অব্যাহত রাখতে কোনো প্রকার বাধা নেই, আর যখন পড়ালেখার কারণে তার দীনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঘাটতি দেখা দেবে, তার নৈতিক চরিত্রের মধ্যে অধঃপতন বা অবক্ষয় পরিলক্ষিত হবে, তার সৌন্দর্য প্রদর্শন বৃদ্ধি পাবে এবং তার নির্লজ্জতা বৃদ্ধি পাবে, তখন তার পড়ালেখা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি নির্ধারিত হবে।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম

ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল (فتاوى و رسائل): ১২/২২২

শিক্ষার কারণে যুবতী কর্তৃক বিবাহ বর্জন করা

প্রশ্ন: এখানে কয়েকটি রীতি বা প্রথা রয়েছে, আর তা হলো, তরুণী অথবা তার পিতা কর্তৃক কোনো পাত্র পক্ষের দেওয়া বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা এই কারণে যে, সে উচ্চ মাধ্যমিক অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করবে অথবা এই কারণে যে, সে কয়েক বছর শিক্ষকতা করবে। সুতরাং এর বিধান কী হবে? যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, তার প্রতি আপনার কী উপদেশ বা পরামর্শ রয়েছে, অথচ অনেক সময় কোনো কোনো তরুণীর বয়স বিয়ে করা ছাড়াই ত্রিশ বা তার বেশি হয়ে যায়?

উত্তর: এর বিধান হলো, কাজটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের পরিপন্থী। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إذا جاءكم من تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فِتْنَةٌ فى الأرض وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ».

“যখন তোমাদের নিকট বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এমন কোনো ব্যক্তি আসে, যার দীন ও চরিত্র তোমাদের পছন্দ হয়, তাহলে তোমরা তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও; যদি তোমরা তা না কর, তাহলে যমীনে ফিতনা ও বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।”[19]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ».

[19] ইমাম তিরমিযী তার ‘আস-সুনান’ গ্রন্থে হাদীসখানা বর্ণনা করেন, হাদীস নং- ১০৮৫

“হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ, বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং যৌনতাকে সংযমী করে।”[20] আর বিবাহ থেকে বিরত থাকার মধ্যে বিয়ের কল্যাণসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয় রয়েছে। সুতরাং আমি নারীদের অভিভাবকদের মধ্যে আমার মুসলিম ভাইদেরকে এবং নারীদের মধ্যে আমার মুসলিম বোনদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তা হলো লেখাপড়া শেষ করা অথবা শিক্ষকতা করার কারণ দেখিয়ে বিয়ে থেকে বিরত না থাকা, আর নারীর পক্ষে তার স্বামীর ওপর এই শর্ত আরোপ করা যাবে যে, সে তার পড়ালেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখবে এবং অনুরূপভাবে সে শিক্ষিকা হিসেবে এক বছর বা দুই বছরের জন্য দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, আর এতে দোষের কিছু নেই যে, নারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার স্তরে উন্নীত হয়ে গেল, যেহেতু এই বিষয়ের দিকে নজর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। সুতরাং আমার অভিমত হচ্ছে নারী যখন প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করবে এবং সে এমনভাবে পড়তে ও লিখতে জানবে যে, সে এই জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর কিতাব ও তার তাফসীর অধ্যয়নের ক্ষেত্রে উপকৃত হবে, আরও উপকৃত হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ ও তার ব্যাখ্যা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে, তাহলে এটাই যথেষ্ট হয়ে যাবে; তবে সে এমন কিছু বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে পারবে, যা মানুষের জন্য খুবই জরুরি, যেমন চিকিৎসা শাস্ত্র এবং অনুরূপ কোনো বিষয়, যখন সে বিষয়ে শিক্ষা

[20] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৪৬৪

গ্রহণের মধ্যে সহশিক্ষা অথবা অন্য কোনো হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তু বা বিষয় না থাকে।

শাইখ ইবন ‘উসাইমীন

সামাজিক ফাতাওয়া (الفتاوى الاجتماعية): ২/২০

বিবাহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে শিক্ষা সমাপ্তকরণে শর্ত করা

প্রশ্ন: বিয়ে সংঘটিত হওয়ার সময় অভিভাবকদের কেউ কেউ তাদের মেয়েদের স্বামীদেরকে স্ত্রীর পড়ালেখা অব্যাহত রাখা এবং পাশ করে বের হওয়ার পর তাকে চাকুরি করানোর আবশ্যকতার শর্তারোপ করে। সুতরাং এই শর্ত বৈধ হবে কিনা? বিয়ের পরে যদি স্বামী সেই শর্ত পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন না করে, সেই ক্ষেত্রে বিধান কী হবে?

উত্তর: বিয়ের সময় স্বামীর ওপর যে শর্তারোপ করা হয়, তা যদি শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম না হয় এবং সে যদি তা মেনে নেয়, তাহলে তা তার ওপর আবশ্যক হয়ে যাবে, অর্থাৎ তার ওপর তা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ».

"শর্তবলীর মধ্যে যা পূরণ করার অধিক দাবি রাখে, তা হলো সেই শর্ত, যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের হালাল করেছ।"[21] কিন্তু স্ত্রী ও তার পরিবারের জন্য উচিৎ হবে না প্রশ্নে উল্লেখিত শর্তের মত কোনো শর্ত আরোপ করা; বরং তাদের উচিৎ হলো বিষয়টিকে বিয়ের পরবর্তী সময়ের জন্য স্বামী ও স্ত্রীর ঐক্যমতের ওপর ছেড়ে দেওয়া, আর এটা জানা কথা যে, স্বামী কোনো নারীকে বিয়ে করে শুধু এই জন্য যে, সে তার এমন স্ত্রী হবে, যে তার সন্তানদেরকে লালনপালন করবে এবং তার অবস্থাকে প্রাণবন্ত করবে; এই জন্য নয় যে, সে হবে একজন শ্রমজীবী নারী, যাকে তার স্বামী মাঝে মধ্যে দেখতে পাবে। সুতরাং এই ধরনের

[21] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৭২

কাজের ক্ষেত্রে সহজ করা এবং ঐসব কোনো শর্ত আরোপ না করাটাই উত্তম ও ভালো পন্থা।

শাইখ ইবন ‘উসাইমীন

ফাতাওয়া ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): **৩/১৫৮**

পিতা মারা গিয়েছে এমন ছাত্রের শিক্ষার খরচ

প্রশ্ন: আমরা তিন ভাই আমাদের পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছি; কিন্তু আমাদের একটি ছোট ভাই আছে, যে পিতার ইন্তিকালের সময় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পড়ালেখা করে ... সুতরাং তার পড়ালেখার খরচের যোগান শরী'আত অনুযায়ী নির্ধারিত তার মীরাসের (উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ) হিসাব থেকে হবে কিনা?

উত্তর: এই যুবকের পড়ালেখার ব্যয় তার পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ও বিয়ের খরচের মত খরচ তার সম্পদ থেকেই মিটাতে হবে, চাই সে তার পিতার ইন্তিকালের পূর্ব থেকেই সেই সম্পদের মালিক হউক অথবা তার পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের অংশ থেকেই হউক। আর যদি জানা যায় যে, তার নিকট কোনো সম্পদ নেই অথবা তার পিতাও কোনো সম্পদ রেখে যায় নি, তাহলে তার যাবতীয় ব্যয়ভার তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে ঐ ব্যক্তির ওপর বর্তাবে, যার ওপর তাদের ব্যয়ভার বহন করা আবশ্যক।

শাইখ ইবন 'উসাইমীন

ফাতাওয়া ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ৩/৫৭

পড়াশোনার অজুহাত দিয়ে শর‘ঈ জ্ঞান অর্জন করা থেকে বিমুখ হওয়া

প্রশ্ন: কোনো ব্যক্তি শর‘ঈ জ্ঞানের সাথে সম্পর্ক নেই এমন শিক্ষা অর্জন নিয়ে ব্যস্ততার অজুহাত অথবা তার কাজের অজুহাত অথবা এ ছাড়া অন্য কোনো অজুহাত দিয়ে শর‘ঈ জ্ঞান অর্জন না করার ওযর (অক্ষমতা) পেশ করতে পারবে কি?

উত্তর: শর‘ঈ জ্ঞান অর্জন করা ফরযে কিফায়া, যা যথেষ্ট পরিমাণ ব্যক্তি আদায় করলে অন্যদের বেলায় সুন্নাত হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো সময় সকল মানুষের ওপর জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক তথা ফরযে আইন হয়ে যায়; যেমন কোনো মানুষ যদি আল্লাহ তা‘আলার কোনো ইবাদত করতে চায়, তাহলে তার ওপর জেনে নেওয়া আবশ্যক হয়ে যায় যে, কীভাবে সে আল্লাহ তা‘আলার জন্য এই ইবাদতটি করবে এবং এর মতো আরও (আল্লাহ উদ্দেশ্যে) অন্যান্য ইবাদত করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানা আবশ্যক তথা ফরযে আইন। সুতরাং যাকে তার নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন-পূরণ শর‘ঈ জ্ঞান অর্জন করা থেকে বিরত রাখে, অথচ সে আবশ্যকীয় ইবাদতের ব্যাপারে যত্নবান, তার ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, এটি ওযর বলে গণ্য হবে এবং তার কোনো পাপ হবে না। কিন্তু তার জন্য উচিৎ হবে তার সামর্থ্য অনুযায়ী শর‘ঈ জ্ঞান অর্জন করা।

শাইখ ইবন ‘উসাইমীন

ফাতাওয়া ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ১/১৭৪

পিতা কর্তৃক তার সন্তানকে শর‘ঈ জ্ঞান অর্জনে বাধা দান

প্রশ্ন: আমি চাই শর‘ঈ জ্ঞান অর্জন করতে, আর আমার পিতা আমাকে আধুনিক শিক্ষা অর্জন করতে বাধ্য করছেন। সুতরাং এই অবস্থায় আমার কর্তব্য কী হবে? আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

উত্তর: তোমার কর্তব্য হলো, তুমি শর‘ঈ জ্ঞান অর্জন করবে এবং তা নিয়ে প্রচেষ্টা চালাবে, আর তোমার পিতাকে বুঝিয়ে বলবে যে, এটাই তোমার ওপর আবশ্যকীয় দায়িত্ব। আর তোমার ওপর আবশ্যক হলো শরী‘আতের প্রকৃত আলেমদের নিকটে তোমার দীন শিক্ষা করবে এবং ফিকহের জ্ঞান অর্জন করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا طاعة في معصية الله انما الطاعة في المعروف».

“আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কোনো আনুগত্য চলবে না; আনুগত্য চলবে শুধু সৎকাজে।”[22]

তিনি আরও বলেন,

«لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق».

“স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।”[23]

সুতরাং আল্লাহর অবাধ্য হয়ে এবং সত্যের বিপরীতে পিতা ও মাতার আনুগত্য করা যাবে না; বরং পিতা ও মাতার আনুগত্য করা যাবে শুধু ভালো কাজের ক্ষেত্রে, খারাপ কাজের ক্ষেত্রে নয়।

শাইখ ইবন বায: ফাতাওয়া ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ৪/২২৯

---

[22] সহীহ বুখারী

[23] আহমদ, ইবন জারির, ইবন খুযাইমা ও তাবারানী

পদস্খলনের আশঙ্কায় আকিদা শিক্ষা এড়িয়ে যাওয়া

প্রশ্ন: ঐ ব্যক্তির বিধান কী হবে, যে ব্যক্তি পদস্খলনের আশঙ্কায় আকিদা শিক্ষাকে পছন্দ করে না, বিশেষ করে তাকদীরের (ভাগ্যের) মাসআলায়?

উত্তর: এই মাসআলাটি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাসমূহের মতোই মানুষের দীন ও দুনিয়ার জন্য খুবই জরুরি। তা বিশ্লেষণ করা ও জানা-বুঝার জন্য তার গভীরে ডুব দেওয়া এবং আল্লাহ (তাবারাকা ওয়া তা'আলা) -এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা আবশ্যক, যাতে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। কারণ, এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে থাকা উচিৎ নয়। আর যেসব মাসআলা জানার ব্যাপারে সে বিলম্বিত করলে তার দীনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে না এবং তা তার অধঃপতনের কারণ হবে বলেও সে আশঙ্কা করে না, তবে তা জানার ব্যাপারে বিলম্বিত করাটা দোষণীয় হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার চেয়ে আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বিদ্যমান থাকবে। তাকদীরের (ভাগ্যের) সাথে সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা পরিপূর্ণভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা বান্দার ওপর আবশ্যক, যাতে সে তার ব্যাপারে বিশ্বস্ত জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। আর বাস্তবে তাতে কোনো জটিলতা নেই (আর আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা)। আর যে কারণে আকিদা শিক্ষা করা কোনো কোনো মানুষের ওপর কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে, দুঃখজনকভাবে তা হচ্ছে এই যে, তারা "কেন" এর চেয়ে "কীভাবে" এর দিকটিকে প্রাধান্য দেয়। আর মানুষ তার কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হয় "কেন" এবং "কীভাবে" -এই দু'টি প্রশ্নবোধক অব্যয় দ্বারা। বলা হয়: 'তুমি কেন এরূপ কাজ করেছ?' এটা হলো ইখলাস। আর, 'তুমি কীভাবে এ কাজটি

করেছ?’ এটা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ। আর এখন অধিকাংশ মানুষ “কীভাবে” প্রশ্নের জবাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যস্ত এবং “কেন” প্রশ্নের জবাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, আর এই জন্য তুমি তাদের অধিকাংশকে পাবে যে, তারা ইখলাস তথা একনিষ্ঠতার দিকটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না, অথচ অনুসরণের ব্যাপারে তারা সুক্ষ্ম বিষয়গুলোর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। সুতরাং বর্তমান সময়ে মানুষ এই দিকটির প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করে, অথচ তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ দিকটির প্রতি তারা উদাসীন, আর সেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো আকিদা (মৌলিক বিশ্বাস), ইখলাস (একনিষ্ঠতা বা ঈমান) ও তাওহীদের (আল্লাহর একত্ববাদের) দিক। এই জন্য তুমি কোনো কোনো মানুষকে দুনিয়া সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে খুবই সাধারণ বিষয়ে প্রশ্ন করতে দেখতে পাবে, অথচ তার অন্তর দুনিয়াদারীতে নিমগ্ন এবং তার বেচাকেনা, উঠাবসা, বসবাস ও পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে সাধারণত আল্লাহ বিমুখ।

তাছাড়া বর্তমান সময়ে কিছু কিছু মানুষ এমনভাবে দুনিয়া পূজারী হয়ে গেছে যে, সে বিষয়টি বুঝতেও পারছে না। কেননা আফসোসের বিষয় হলো, তাওহীদ ও আকিদার দিকটির প্রতি শুধু সাধারণ জনগণ যে গুরুত্ব দিচ্ছে না, তা নয়; বরং কিছু কিছু তালেবে ইলমও তাদের সাথে রয়েছে। আর এটা এমন বিষয়, যার কতগুলো মারাত্মক প্রভাব রয়েছে, যেমনিভাবে আমল ব্যতীত শুধু আকিদার ওপর গুরত্বারোপ করাটাও ভুল অথচ আমলকে শরী‘আত প্রবর্তক আকিদার হিফাযতকারী ও প্রতিরক্ষা-দেয়ালের মতো করেছেন। কেননা, আমরা গুরুত্বের সাথে প্রচারমাধ্যমের

সাহায্যে শ্রবণ করি এবং পত্রপত্রিকায় পাঠ করি যে, 'দীন হচ্ছে সহজ আকীদার নাম' ইত্যাদি। অথচ মূলত এটা উদ্বেগজনক এজন্য যে, এটি হয়তো এমন একটি দরজা হবে, যে দরজা দিয়ে এমন ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটবে, যে ব্যক্তি হারাম জিনিসকে হালাল করে ফেলে বলবে, আমার আকীদা তো ঠিক আছে!

তাই সম্মিলিতভাবে দু'টি বিষয়ের প্রতিই মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, যাতে "কেন" এবং "কীভাবে" উভয় প্রশ্নের জবাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

জবাবের সারসংক্ষেপ: ব্যক্তির ওপর আবশ্যক হলো, তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) ও আকিদা বিষয়ে পড়াশুনা করা, যাতে সে তার ইলাহ ও মা'বুদ আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে যথাযথ উপলব্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হতে পারে, আর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে পারে আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলী এবং তাঁর কর্মকাণ্ডসমূহের ব্যাপারে; দূরদর্শী হতে পারে তাঁর কলাকৌশল এবং শরী'আত ও সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে, যার ফলে সে নিজেকে পথভ্রষ্ট করবে না অথবা অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে না। আর শ্রেষ্ঠ সত্ত্বার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে ইলমুত তাওহীদ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান, আর এই জন্য বিজ্ঞ আলেমগণ তার নামকরণ করেছেন 'আল-ফিকহুল আকবর' (الفقه الأكبر) বা শ্রেষ্ঠ ফিকহ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين».

“আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তিনি তাকে দীন সম্পর্কে সুক্ষ্ম জ্ঞান (ফিকহ) দান করেন।”[24] এই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম বিষয় হলো তাওহীদ ও আকিদা সংক্রান্ত জ্ঞান।

কিন্তু ব্যক্তির ওপর এটাও আবশ্যক যে, সে চিন্তাভাবনা করবে কীভাবে এবং কোনো উৎস থেকে সে এই জ্ঞান অর্জন করবে। সুতরাং তার জন্য উচিৎ হবে এই জ্ঞান থেকে সর্বপ্রথম যা নির্ভেজাল ও সন্দেহমুক্ত, তাই গ্রহণ করা, অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে সে ঐসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেবে, যাতে বিদ‘আত ও সন্দেহ-সংশয়ের আমদানি হয়েছে; ফলে সে তা প্রতিরোধ ও প্রত্যাখ্যানে ভূমিকা রাখতে পারবে এবং তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারবে ইতোপূর্বে লব্ধ নির্মল আকিদার আলোকে। আর যে উৎস থেকে সে তাওহীদ ও আকিদা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করবে, সেই উৎস হতে হবে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ, অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহ ‘আনহুমের বক্তব্য, অতঃপর তাঁদের পরবর্তীকালে তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনদের মধ্যকার ইমামগণ কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্য, অতঃপর জ্ঞান ও আমানতদারীতায় নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত আলেমগণ কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্য, বিশেষ করে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা এবং তাঁর ছাত্র ইবনল কায়্যিম (তাঁদের ও সকল মুসলিম ইমামগণের ওপর আল্লাহ্র অশেষ রহমত ও সন্তুষ্টি)।

---

[24] তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৪৫

শাইখ ইবন 'উসাইমীন:

মাজমু'উ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল (مجموع فتاوى و رسائل): ২/৭৭

(ঈষৎ পরিবর্তিত)

সালাফে সালেহীন (সৎ পূর্বসূরীগণ) এর মতের বিপরীত আকিদা শিক্ষা করা

প্রশ্ন: ঐসব ছাত্রদের কোনো পাপ হবে কিনা, যারা সালাফে সালেহীন (সৎ পূর্বসূরীগণ) এর বুঝের বাইরে গিয়ে আকিদা শিক্ষা করে আর যুক্তি প্রদর্শন করে এই বলে যে, অমুক আলেম অথবা অমুক ইমাম এই আকিদায় বিশ্বাস পোষণ করে?

উত্তর: এইভাবে আকিদা শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্রের এরূপ ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না, যেহেতু তার নিকট সত্য বা সঠিক বিষয়টি পৌঁছেছে। কারণ, তার ওপর ওয়াজিব হলো সত্যের অনুসরণ করা, তা যেখানেই থাকুক এবং তার কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তা নিয়ে গবেষণা করা। আর (আল-হামদুলিল্লাহ) সত্য ও হক বিষয়টি নির্ভেজাল ও সুস্পষ্ট ঐ ব্যক্তির জন্য, যার নিয়ত পরিশুদ্ধ এবং চলার পথ সুন্দর। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেন,

﴿وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٖ ١٧﴾ [القمر: ١٧]

"আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?"- (সূরা আল-কামার: ১৭) কিন্তু কোনো কোনো মানুষের (যেমনটি প্রশ্নকারী ভাই উল্লেখ করেছেন) অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তি থাকে, তাদের সিদ্ধান্ত বা মতামত থেকে তারা একবিন্দু সরে আসে না। অথচ তাদের মনে বদ্ধমূলও হয় যে, এদের সিদ্ধান্ত বা মতামতগুলো দুর্বল অথবা বাতিল; কিন্তু গোঁড়ামি ও প্রবৃত্তি তাদেরকে বাধ্য করছে তাদের (মতামতের) সাথে একাট্টা হতে, যদিও তাদের নিকট প্রকৃত সত্য বিষয়টি সুস্পষ্ট

হয়ে যায়। (অর্থাৎ এ ধরণের লোকদের অনুসরণের ওজর কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না)

শাইখ ইবন 'উসাইমীন

ফাতওয়ায়ে আকিদা (فتاوى العقيدة): পৃ. ২৬২

আলেমদের মধ্যে ফিকহী বিরোধের ক্ষেত্রে জ্ঞান অনুসন্ধানী ছাত্রের ভূমিকা

প্রশ্ন: আমি শরী'আহ অনুষদের প্রথম বর্ষের ছাত্র; অনেক বিরোধপূর্ণ মাসআলা আমাদের নিকট পেশ করা হয়, আর এসব মাসআলার ক্ষেত্রে কোনো কোনো অধিক গ্রহণযোগ্য মাসআলা এখনকার সময়ের আলেমদের কোনো কোনো বক্তব্যের বিপরীত অথবা আমরা মাসআলাসমূহ গ্রহণ করি, কিন্তু সেগুলো থেকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মত কিছু নেই; ফলে আমরা আমাদের কাজে-কর্মে হয়রানির শিকার হই। সুতরাং বিরোধপূর্ণ মাসআলার হুকুমের (বিধানের) ক্ষেত্রে অথবা যখন সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে আমরা প্রশ্নের সম্মুখীন হব, তখন আমরা কী করব? আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

উত্তর: প্রশ্নকারী ব্যক্তি যে প্রশ্নটির অবতারণা করেছে, সেটি শুধু শরী'আহ অনুষদের ছাত্রের প্রশ্নই নয়, বরং এটা সাধারণভাবে প্রত্যেকেরই প্রশ্ন, যখন সে কোনো ফাতওয়াকে কেন্দ্র করে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখে, তখন সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থমকে দাঁড়ায়; কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো, এতে হয়রান হওয়ার কিছুই নেই। কারণ, যখন কোনো মানুষের নিকট একই বিষয়ে বিভিন্ন রকম ফাতওয়া আসবে, তখন সে ঐ ব্যক্তির মতামতের অনুসরণ করবে, যাকে সে তার অধিক জ্ঞান ও ঈমানী শক্তির কারণে সত্যের খুব কাছাকাছি দেখবে; যেমনিভাবে মানুষ যখন অসুস্থ হয়, অতঃপর তার চিকিৎসার ব্যাপারে দু'জন ডাক্তার ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে, তখন সে ঐ ডাক্তারের কথাকে গ্রহণ করে, তার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র প্রদানে যার কথাটিকে তার নিকট অধিক

গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। আর যদি তার নিকট দু'টি বিষয়ই সমান হয়, অর্থাৎ যদি বিরোধপূর্ণ মতামত পেশকারী দুই আলেমের কোনো একজনকে প্রাধান্য দেওয়া না যায়, তখন আলেমদের কেউ কেউ বলেন, সে কঠিন মতটির অনুসরণ করবে, কেননা এতে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হবে, আর কোনো কোনো আলেম বলেন, সে সহজ মতের অনুসরণ করবে। কারণ, এটাই ইসলামী শরী'আতের মূলনীতি; আবার কেউ কেউ বলেন, তার জন্য এটা এবং ঐটা উভয়টার যে কোনো একটা গ্রহণ করার ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকবে, আর অধিক গ্রহণযোগ্য কথা হলো, সে সবচেয়ে সহজ মতামতটি গ্রহণ করবে। কারণ, এটা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সহজ-সরলতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা আল্লাহ (তাবারাকা ওয়া) তা'আলা বলেন,

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

তিনি আরও বলেন,

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ ﴾ [الحج: ٧٨]

"তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেন নি।"- [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৭৮]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا».

“তোমরা সহজ কর, কঠিন বা জটিল করো না।”[25] আর যে কোনো বস্তুর ব্যাপারে মূলকথা বা মৌলিক নীতিমালা হচ্ছে, ‘দায়দায়িত্ব বা জিম্মাদারী (কঠিনতা থেকে) মুক্ত থাকা’ যতক্ষণ না সে দায়-দায়িত্ব বা জিম্মাদারী (মত কঠিনতা) মুক্ত না হওয়ার ব্যাপারটি সাব্যস্ত হবে।

আর এই কায়দা বা নিয়ম ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি নিজে নিজে সঠিক বিষয় অনুধাবন করতে সক্ষম নয়। সুতরাং সে যদি সত্য অনুধাবন বা উদঘাটনে সক্ষম হয়, যেমন, সে এমন ছাত্র, যে এই মাসআলার মধ্যে কি বলা হয়েছে, তা পাঠ করতে, অতঃপর তার নিকট বিদ্যমান শরী‘আতের দলীলসমূহের মাধ্যমে যা তার নিকট শ্রেষ্ঠ মনে হয়, তা প্রাধান্য দিতে সক্ষম; তাহলে এমতাবস্থায় তার ওপর জরুরি হলো, সে গবেষণা করবে ও পড়াশুনা করবে, যাতে সে এসব মতামত থেকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মতটি সম্পর্কে জানতে পারে, যেসবের ব্যাপারে আলেমগণ মতবিরোধ করেছেন।

শাইখ ইবন ‘উসাইমীন

ফাতাওয়া (فتاوى): ১/৪৫

[25] আহমাদ

কোনো কোনো ছাত্রের পক্ষ থেকে আলেমদের নিন্দা বা সমালোচনা করা

প্রশ্ন: কিছু সংখ্যক যুবকের ব্যাপারে সম্মানিত শাইখের কী অভিমত— তাদের কেউ কেউ আবার তালেবে ইলম বা শরী'আতের ছাত্র, যাদের অভ্যাস হয়ে গেছে তাদের একে অপরের নিন্দা করা, তাদের নিকট থেকে জনসাধারণকে দূরে সরিয়ে দেওয়া এবং জনগণকে সতর্ক করা, এটা কি শরী'আত সম্মত কাজ, যার জন্য সাওয়াব দেওয়া হবে অথবা শাস্তি দেওয়া হবে?

উত্তর: আমি মনে করি এ ধরণের কাজ হারাম। যখন কোনো মানুষের জন্য তার এমন মুমিন ভাইয়ের গীবত করা বৈধ নয়, যিনি আলেম নন, তাহলে তার জন্য কীভাবে তার ঈমানদার আলেম ভাইদের গীবত করা বৈধ হবে? সুতরাং মুমিন ব্যক্তির জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো, সে তার মুমিন ভাইদের গীবত করা থেকে নিজের জিহ্বাকে বিরত রাখবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢﴾ [الحجرات: ١٢]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ কোনো কোনো অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-হুজুরাত,

আয়াত: ১২] আর এই ব্যক্তি যিনি এসব বিপদজনক কাজে জড়িয়ে পড়েছেন (গীবত অযথা সমালোচনা করছেন) তার জেনে রাখা উচিৎ, সে যখন আলেমের নিন্দা ও সমালোচনা করবে, তখন তা অবশ্যই ঐ সমালোচিত আলেম যেসব সত্য কথা বলেছেন, তাও প্রত্যাখ্যান করার কারণ হিসেবে গণ্য হবে ...। সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যান করার খারাপ পরিণতি ও তার পাপ ঐ ব্যক্তির ওপর বর্তাবে, যে ব্যক্তি আলেমের নিন্দা ও সমালোচনা করেছে। কারণ, আলেমের নিন্দা ও সমালোচনা করাটা শুধু কোনো ব্যক্তির সমালোচনা করা নয়, বরং তা হলো নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকারের নিন্দা ও সমালোচনা করা।

কারণ, আলেমগণ হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী। সুতরাং যখন আলেমগণ সমালোচিত ও দুর্নামের শিকার হবেন, তখন তাদের নিকট যে জ্ঞান রয়েছে, তা জনগণ বিশ্বাস করবে না, অথচ তা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। আর যখন এই সমালোচিত আলেম শরী'য়াতের কোনো বিষয় নিয়ে আসবে, তখন তারা তার কিছুই বিশ্বাস করবে না।

আমি বলি না যে, সকল আলেমই নিষ্পাপ, বরং প্রত্যেক মানুষের নিকট থেকে ভুল-ক্রুটির প্রকাশ ঘটে, আর তুমি যখন কোনো আলেমকে এমন বিষয়ে ভুল করতে দেখবে, যা তোমার আকিদা বা বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট, তখন তুমি তার সাথে যোগাযোগ কর এবং তার সাথে পারস্পরিক বুঝাপড়া করা, অতঃপর যদি তোমার কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত সত্য বিষয়টি তার সাথে রয়েছে, তাহলে

তোমার জন্য আবশ্যক হলো তার অনুসরণ করা, আর যদি বিষয়টি তোমার কাছে স্পষ্ট না হয়, কিন্তু তুমি তার কথার সঙ্গত কারণ পেয়ে থাক, তাহলে তোমার ওপর আবশ্যক হলো বিরত থাকা, আর যদি তার কথার সঙ্গত কারণ খুঁজে না পাও, তাহলে তার কথা থেকে সতর্ক কর। কারণ, ভুলের স্বীকৃতি প্রদান করা বৈধ নয় ...; কিন্তু তুমি তার সমালোচনা ও নিন্দা করতে পারবে না, যদিও তা উত্তম নিয়তে হউক না কেন। কেননা তিনি হলেন সুপরিচিত আলেম, আর আমরা যদি এমন কোনো ভুলের কারণে ভালো নিয়তে প্রসিদ্ধ আলেমদের সমালোচনা করতে চাই, যে ভুলটি তারা কোনো ফিকহী মাসআলার ক্ষেত্রে করেছেন, তাহলে আমরা অনেক বড় বড় আলেমেরও সমালোচনা করতে পারব; কিন্তু এই ক্ষেত্রে আবশ্যক হলো আমি যা (পূর্বে) আলোচনা করেছি (অর্থাৎ সমালোচনা না করে তার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসা...)। আর তুমি যখন কোনো আলেমের ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করবে, তখন তুমি তার সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনা করবে, অতঃপর যদি তোমার কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত সত্য বিষয়টি তার সাথে রয়েছে, তাহলে তুমি তার অনুসরণ করবে, আর যদি সঠিক বিষয়টি তোমার সাথে থাকে, তাহলে সে তোমার অনুসরণ করবে ..., আর যদি বিষয়টি স্পষ্ট না হয় এবং তোমাদের মধ্যকার মতবিরোধটি বৈধ মতবিরোধের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তোমার ওপর আবশ্যক হলো সেই বিষয়ে পারস্পরিক সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকা এবং সে যেন তাই বলে, যা সে বলে থাকে, আর তুমিও তাই বলবে, যা তুমি বলে থাক।

আলহামদুলিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত) ..., বিতর্ক ও মতবিরোধ শুধু এই যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ... বরং এই বিরোধ সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে আমাদের এই দিন পর্যন্ত চলছে; তবে যখন ভুলের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে, কিন্তু সে তার কথাটিকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে, তখন তোমার আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো ভুল-ত্রুটি স্পষ্ট করে দেওয়া এবং তার থেকে দূরে সরে আসা; তবে ঐ ব্যক্তিকে দোষারোপ করে এবং তার থেকে পরিকল্পিতভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করার ভিত্তিতে নয়। কারণ, এই ব্যক্তি তুমি যে বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক করেছ তা ছাড়া অনেক সময় সত্য বক্তব্যও দিয়ে থাকেন ...।

মোটকথা, আমি আমার ভাইদেরকে এই পরীক্ষা (আলেমদের সমালোচনা) বা এই ব্যাধি (অন্যের বিরুদ্ধে কথা বলা) থেকে সাবধান ও সতর্ক করছি, আর আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার জন্য ও তাদের জন্য এমন সব বিষয় থেকে পরিত্রাণ ও প্রতিকার প্রার্থনা করছি, যা আমাদেরকে আমাদের দীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে কলুষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

শাইখ ইবন 'উসাইমীন

ফাতাওয়া (فتاوى): ১/৬২

(ঈষৎ পরিবর্তিত)

আলেমদের প্রতি সাধারণ মানুষের কর্তব্য

প্রশ্ন: আলেমদের প্রতি সাধারণ মানুষের এবং সাধারণ মানুষের প্রতি আলেমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

উত্তর: সাধারণ মানুষের জন্য তাদের আলেমদের প্রতি কর্তব্য হলো, তারা তাদেরকে সম্মান করবে এবং তাদের নিকট থেকে উপকৃত হবে, যেমনিভাবে আলেমদের ওপর আবশ্যকীয় করণীয় হলো, তারা তা'আলার তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং তারা হবে সমাজের জন্য উত্তম আদর্শ, আর তাদের আরও করণীয় হলো, তারা জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেবে, জনগণকে আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকবে এবং শাসকশ্রেণী ও প্রজাদেরকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করবে, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ يا رسول الله؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».

"দীন হচ্ছে (জনগণের) কল্যাণ কামনা করা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কার জন্য? তিনি বললেন: আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও সমস্ত মুসলিমের জন্য।"[২৬]

শাইখ আল-ফাওযান

ফাতাওয়া (الفتاوى): ২/১৪৪

---

[26] হাদীসটি ইমাম মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ রহ. বর্ণনা করেন। তাছাড়া ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ রহ. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এবং ইমাম আহমদ আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

শর‘ঈ জ্ঞান বিকাশের পথ

প্রশ্ন: আমি শরী‘য়াহ্ অনুষদ থেকে পাশ করেছি এবং বর্তমানে চাকুরি করি, কিন্তু আমি জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী এবং আমি বইপত্র ও অধ্যয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করি। সুতরাং আপনার দৃষ্টিতে এমন কী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংবলিত কিতাবপত্র আছে, যেগুলো আমি নিয়মিত অধ্যয়ন করব?

উত্তর: তোমার দায়িত্ব হলো ঐসব গ্রন্থ অধ্যয়ন করা, যা তোমার জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে, যা তুমি শরী‘আ অনুষদে অধ্যয়ন করেছ; যেমন, তাফসীর ও আকাঈদ বিষয়ক কিতাবসমূহ, হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ, ফিকহ ও উসূল সংক্রান্ত কিতাবসমূহ, ইলমে নাহু ও আরবি ভাষা বিষয়ক গ্রন্থসমূহ এবং সাধারণ সাংস্কৃতিক বিষয়ক উপকারী গ্রন্থসমূহ। সুতরাং এসব গ্রন্থ থেকে তোমর কাছে যা সহজ মনে হয়, তা অধ্যয়ন কর, আরও বিশেষ করে তাফসীরু ইবনে কাসীর (تفسير ابن كثير), শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আবদিল ওয়াহহাবের ‘কিতাবুত তাওহীদ’ (كتاب التوحيد) ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যা ও ইবনল কায়্যিমের গ্রন্থসমূহ; কিতাবু সুবুলিস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম (كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام), নাইলুল আওতার শরহু মুন্তাকাল আখবার (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار), জামে‘উল ‘উলুম ওয়াল হিকাম শরহুল আরবা‘ঈনা হাদিসা (جامع العلوم و الحكم شرح الأربعين حديثا), শরহুয যাদ ওয়া কাশশাফুল কানা‘য়ে ফিল ফিকহ (شرح

(الزاد و كشاف القناع في الفقه)। আর অধ্যয়ন হবে বুঝেশুনে এবং যত্নসহকারে, আর আল্লাহ হলেন তাওফীক দানকারী।

আর তোমার আকাঙ্খা থাকবে যত্নসহকারে সংক্ষিপ্ত কিতাবসমূহ (المختصرات) মুখস্ত করা এবং সেগুলোর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা; অতঃপর ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে আলোচিত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নের দিকে মনোনিবেশ করা, আরও অধ্যয়ন কর ফাতওয়া বিষয়ক সংকলনসমূহ, যেমন, আদ-দুরারুস সুন্নীয়া ফিল আজওয়াবাতিন নাজদিয়্যা (الدرر السنية في الأجوبة النجدية), শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যা'র ফাতওয়া সংকলন (مجموع فتاوي), শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীমের ফাতওয়া সংকলন (مجموع فتاوي), শাইখ আবদুর রহমান আস-সা'দী'র ফাতওয়া সংকলন (مجموع فتاوي) এবং শাইখ আবদুল আযীয ইবন বাযের ফাতওয়া সংকলন (مجموع فتاوي)।

শাইখ আল-ফাওযান

ফাতাওয়া (الفتاوى): ২/১৫৪

নারীদের ইলম বা দীনী জ্ঞান শিক্ষার উপায়-উপকরণসমূহ

প্রশ্ন: নারীদের ইলম বা দীনী জ্ঞান শিক্ষার অনন্য উপায় কী?

উত্তর: আল্লাহর শুকরিয়া যে, এই যুগে শিক্ষার অনেক উপায়-উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে:

প্রথম উপায়: ঐসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ, যেগুলো সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে, তাতে বহু আবশ্যক বিষয় চালু রয়েছে, আর যারা তার সিলেবাস ও কারিকুলাম তৈরির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তারা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য, চাই সেই বিষয়গুলো আকিদা সংশ্লিষ্ট হউক অথবা কারিগরি সংশ্লিষ্ট হউক অথবা বিধিবিধান সংশ্লিষ্ট হউক অথবা সাহিত্য সংশ্লিষ্ট হউক অথবা অনুরূপ কোনো বিষয় হউক। সুতরাং এসব বিষয়গুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে নারীদের ইসলামী সঠিক জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় উপায়: সে বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করবে। আল্লাহর শুকরিয়া যে, ষাট বা সত্তর বছর পূর্বে কিতাবের স্বল্পতার পর বর্তমানে পর্যাপ্ত পরিমাণে কিতাবপত্র পাওয়া যাচ্ছে, তখন খুব কমই বইপত্র ছিল, আর এখন- আল-হামদুলিল্লাহ- বইপত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়েছে এবং তার প্রকাশনা ও মুদ্রণ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর প্রতিটি ঘরেই অনেক বইপত্র রয়েছে এবং নারীর পক্ষে তার অবসর সময়ে খুব সহজেই তার ইচ্ছামত বইপত্র অধ্যয়ন করা সম্ভব, চাই তা হালাল ও হারামের বিধান সংক্রান্ত গ্রন্থ হউক অথবা ইবাদত সংক্রান্ত গ্রন্থ হউক অথবা লেনদেন সংক্রান্ত গ্রন্থ হউক অথবা সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ হউক অথবা আকাঈদ, তাওহীদ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ হউক অথবা আগ্রহ-উদ্দীপনা, ভীতি প্রদর্শন, কোমলতা ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থ

হউক। সুতরাং নারীর পক্ষে যে কোনো বই নাগালের মধ্যে পাওয়া সম্ভব হওয়ার কারণে সে বইপত্র পাঠ করবে এবং তার থেকে উপকৃত হবে।

তৃতীয় উপায়: তা হলো বিভিন্ন প্রকার বক্তৃতা, বিবৃতি, ভাষণ ইত্যাদি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা। কেননা নারীর পক্ষে বিভিন্ন প্রকারের সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব, যা নারীদের জন্য বিশেষ স্থানে অনুষ্ঠিত হয় এবং পুরুষ ব্যক্তি যেভাবে উপকৃত হবে, সেও ঠিক সেভাবে উপকৃত হতে পারবে, আর এই উপকারের প্রভাব তার সাথে সার্বক্ষণিক বিদ্যমান থাকবে।

চতুর্থ উপায়: তা হলো বিভিন্ন ধরনের অডিও ও ভিডিও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা; আল-হামদুলিল্লাহ! এটা খুব সহজ উপায়, আর এর মাধ্যমে অর্জিত হয় নৈতিক প্রভাব ও বড় ধরনের উপকার। সুতরাং যখন সভা ও সেমিনারসমূহ অডিও ও ভিডিও'র মাধ্যমে রেকডিং বা ধারণ করার কাজ অব্যাহত থাকবে এবং তা বিভিন্ন স্থানে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা হবে, তখন নারীর পক্ষে তার ঘরের মধ্যে স্বীয় কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় তা শ্রবণ করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

পঞ্চম উপায়: রেডিও (বেতার) শ্রবণ করা, যাতে আল-কুরআন প্রচারের মত বিভিন্ন প্রকার সময় উপযোগী বিষয় প্রচার করা হয়; সুতারাং তাতে অনেক কল্যাণ রয়েছে; অতএব, আল্লাহর শুকরিয়া- এভাবে শিক্ষা অর্জনের অনেক উপায় রয়েছে।

শাইখ ইবন জিবরীন

ফায়দা ও ফাতাওয়া (فوائد و فتاوى): পৃ. ৪৭

শরী'আতের বক্তব্যের সাথে ভৌগলিক বিষয়ের বিরোধ হয় কি?

প্রশ্ন: আমরা কীভাবে দীন ও কিছু কিছু বিষয়ে অর্জিত শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করব, যা বাহ্যিকভাবে উভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: আমরা দীনের মধ্যে জানতে পেরেছি যে, নক্ষত্ররাজিকে তিনটি জিনিসের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে: এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে আকাশকে সুসজ্জিত করার জন্য, শয়তানদেরকে বিতাড়িত করার জন্য এবং এগুলোকে নিশানা বানানো হয়েছে, যাতে তার দ্বারা সঠিকভাবে পথ চলা যায়, আর অপরদিকে আমরা ভূগোলে পড়েছি যে, এগুলো হলো কিছু পদার্থের সমষ্টি, যার পরিভ্রমণের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন রয়েছে। আর আমরা রাতের বেলায় যাকে জ্বলতে ও পতিত হতে দেখি, তা অগ্নিশিখা ও উল্কা, যা এক আকর্ষণ থেকে বের হয়ে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণে আসে; অতঃপর তা প্রজ্বলিত হয় এবং প্রতি সেকেন্ডে ৪৫ মাইল গতিতে পতিত হয়।

উত্তর:

الحمد لله, و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه و بعد :

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আর সালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের ওপর)

অতঃপর.......

নিশ্চয়ই যিনি কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন এবং ওহীর মাধ্যমে ইসলামের শরী'আত প্রেরণ করেছেন তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তিনি হলেন মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানী

তা‘আলা, যিনি আকশমণ্ডলী ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন সকল কিছু, আর তাকে যার জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার অনুগত করে দিয়েছেন এবং তিনি জানেন তার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ও গোপন রহস্যসমূহ গচ্ছিত রেখেছেন, সে সম্পর্কে। সুতরাং তিনি যা সৃষ্টি করেছেন ও তাঁর বান্দাদের জন্য অনুগত করেছেন, তার সাথে সাথে তিনি যে বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন অথবা যা শরী‘আত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, তা পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়; বরং এর প্রতিটিই সুবিন্যস্ত, তার সৃষ্টি ও শৃঙ্খলার সাথে সাথে তার ব্যাপারে দেওয়া তথ্য ও শরী‘আতের বক্তব্যের মাঝে যথেষ্ট মিল রয়েছে। সুতরাং তাঁর দেওয়া তথ্য বাস্তবসম্মত এবং তাঁর সৃষ্টি ও তাকে নিয়মের অধীন করাটা তাঁর দেওয়া তথ্যের দাবি অনুযায়ী যথাযথ; অতএব মানুষ যদি মনে করে আল-কুরআনের মধ্যে দেওয়া আল্লাহর বক্তব্য অথবা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মধ্যে বিরোধ বা বৈপরীত্য রয়েছে, তাহলে তার এমন ধারণার উৎস হলো তার জ্ঞানের কমতি অথবা তার বুঝের ঘাটতি এবং তার গবেষণা বা অনুসন্ধানের কমতি অথবা সৃষ্টিতত্ত্ব ও শরী‘আতের বক্তব্য সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের অভাব, আর এর দৃষ্টান্ত হলো যা তা‘আলা’র পক্ষ থেকে তাঁর কিতাবের মধ্যে এসেছে, তিনি বলেন,

﴿إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِزِينَةٍ ٱلۡكَوَاكِبِ ٦ وَحِفۡظٗا مِّن كُلِّ شَيۡطَٰنٖ مَّارِدٖ ٧ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلۡمَلَإِ ٱلۡأَعۡلَىٰ وَيُقۡذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٖ ٨ دُحُورٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٞ وَاصِبٌ ٩ إِلَّا مَنۡ خَطِفَ ٱلۡخَطۡفَةَ فَأَتۡبَعَهُۥ شِهَابٞ ثَاقِبٞ ١٠﴾ [الصافات: ٦، ١٠]

“নিশ্চয় আমরা কাছের আসমানকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি, এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে। ফলে ওরা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শুনতে পারে না। আর তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সব দিক থেকে- বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।” [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৬-১০]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَلَقَدۡ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلۡنَٰهَا رُجُومٗا لِّلشَّيَٰطِينِۖ وَأَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥﴾ [الملك: ٥]

“আর অবশ্যই আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।” [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَلَقَدۡ جَعَلۡنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجٗا وَزَيَّنَّٰهَا لِلنَّٰظِرِينَ ١٦ وَحَفِظۡنَٰهَا مِن كُلِّ شَيۡطَٰنٖ رَّجِيمٍ ١٧ إِلَّا مَنِ ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّمۡعَ فَأَتۡبَعَهُۥ شِهَابٞ مُّبِينٞ ١٨﴾ [الحجر: ١٦، ١٨]

“আর অবশ্যই আমরা আকাশে বুরুজসমূহ সৃষ্টি করেছি এবং দর্শকদের জন্য সেগুলোকে সুশোভিত করেছি, আর প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হতে আমরা সেগুলোকে সুরক্ষিত করেছি; কিন্তু কেউ চুরি করে শুনতে চাইলে দীপ্ত শিখা তার পশ্চাদ্ধাবন করে।” [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ১৬- ১৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهۡتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۗ قَدۡ فَصَّلۡنَا ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٩٧﴾ [الانعام: ٩٧]

“আর তিনিই তোমাদের জন্য তারকামণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, যেন তা দ্বারা তোমরা স্থলের ও সাগরের অন্ধকারে পথ খুঁজে পাও। অবশ্যই আমরা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৯৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَعَلَٰمَٰتٖۚ وَبِٱلنَّجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ ١٦ ﴾ [النحل: ١٦]

“এবং পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহও। আর তারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১৬]

আর সহীহ সুন্নাহর মধ্যেও এই ব্যাপারে কিছু বক্তব্য এসেছে, যা আল-কুরআনের বক্তব্যসমূহের সাথে অর্থগত দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যে ব্যক্তি এই বক্তব্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি দেবে, সে তাতে স্পষ্ট বুঝতে পারবে যে, এতে বস্তুত নক্ষত্রসমূহের কিছু বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে; তাতে এমন কিছু নেই, যা নক্ষত্ররাজির উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার প্রমাণ বহন করে, যেমনিভাবে তার মধ্যে এমন কিছুও নেই, যা নক্ষত্ররাজিকে শুধু ঐসব উল্কার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করার প্রমাণ বহন করে, যার দ্বারা আমরা শয়তানকে আঘাত করতে দেখতে পাই এবং তার দ্বারা তাদের (শয়তানদের) মধ্যে যারা চুরি করে (ঊর্ধ্বতন মহলের সিদ্ধান্ত থেকে) কোনো তথ্য শুনতে চায়, তাদেরকে আঘাত করা হয়। যেমনিভাবে এ সকল বক্তব্যের মধ্যে অন্যান্য উল্কারাজিকে সাব্যস্ত বা নিষেধ করার মত

কিছুও নেই; বিষয়টি এমন প্রত্যেক লোকই বুঝতে পারে যার কাছে আরবদের ভাষা জ্ঞান রয়েছে, আর যার কাছে কোনো কিছু সীমাবদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত আরবদের ভাষার অব্যয়সমূহের জ্ঞান রয়েছে।

সুতরাং যখন জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে প্রমাণিত হয় যে, সেখানে মহাশূন্যে পাথর ও সৌর জাগতিক বিভিন্ন বস্তু ছড়িয়ে আছে এবং তা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রত্যেকটি গ্রুপ তাদের মধ্যকার সবচেয়ে বড় নক্ষত্রের আকর্ষণিক বলয়ে অবস্থিত। আর তা যখন এই নক্ষত্রের আকর্ষণিক বলয় থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, অতঃপর ঐ নক্ষত্রের বলয় থেকে দূরে সরে যায় এবং তার থেকে অপর এক নক্ষত্রের আকর্ষণিক বলয়ের নিকটবর্তী হয়, তখন তা দ্রুত গতিতে নীচের দিকে ধাবিত হয় এবং তার পৃষ্ঠদেশের সাথে অপরাপর নক্ষত্রের পৃষ্ঠদেশের ঘর্ষণের ফলে অগ্নিশিখার জন্ম হয়, সৃষ্টিজগতের এই বাহ্যিকতাকে উল্কা নামে নামকরণ করা হয়। যখন এটা প্রমাণিত, তখন তা ইসলামী শরী'আতের নস তথা বক্তব্যসমূহের মধ্যে যেই ভাষ্য এসেছে, তার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, আর সেই ভাষ্যের মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র নক্ষত্ররাজির মধ্যে উল্কা বা অগ্নিশিখার দ্বারা শয়তানদেরকে আঘাত করার সংবাদ। কেননা হতে পারে উল্কারাজির প্রকাশ দু'টি কারণেই হয়ে থাকে। কারণ, জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে এমন কথা নেই যা প্রমাণ করে যে উল্কারাজি তারকাপূঞ্জ ছাড়া অন্য কোথাও থেকে ঝরে পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তদ্রূপ কুরআন ও সুন্নাহ'র বক্তব্যের মধ্যেও এমন কথা নেই যে, শয়তানদেরকে বিতাড়িত করার জন্য নিক্ষিপ্ত উল্কারাজি তারকারাজির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আর প্রশ্নকারী যে অগ্নিশিখা বা উল্কাপিণ্ডের কথা উল্লেখ করেছে, তা ভূগোল বিশেষজ্ঞদের মতে নিক্ষিপ্ত বস্তু যা উল্কাপিণ্ড হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়, তবে তা প্রজ্জ্বলিত হয় না এবং তা ছাই-ভস্মেও রূপান্তরিত হয় না। সুতরাং তা শিহাব (شهاب) জাতীয় উল্কাপিণ্ডের শ্রেণীভুক্ত নয়, বরং তা শিহাব (شهاب) জাতীয় উল্কাপিণ্ডের বিপরীত শ্রেণীর উল্কাপিণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। অতএব প্রশ্নকারীর কর্তব্য হচ্ছে, সে তার জ্ঞান ও তথ্যভাণ্ডারকে বিশ্লেষণ করবে এবং তার দীন ও দুনিয়ার বিষয়সমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবে, আর আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে তার মর্যাদা সম্পর্কে জানে এবং কোনো বিষয়ে জটিলতার মুখোমুখি হলে তার মান বা স্তরের নির্ধারিত সীমারেখায় দাঁড়িয়ে যায়।

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم.

(আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর)।

স্থায়ী পরিষদ, শিক্ষা-গবেষণা ও ফাতওয়া বিষয়ক

সভাপতি	সহ-সভাপতি
আবদুল আযীয ইবন বায	আবদুর রাজ্জাক 'আফীফী
সদস্য	সদস্য
বদুল্লাহ ইবন গুদাইয়ান	আবদুল্লাহ ইবন কু'উদ

স্থায়ী পরিষদের ফাতাওয়া (فتاوى اللجنة الدائمة): ১/৪২৬, ফাতওয়া নং-১৫৯১

রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry) কি জাদুবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত?!

প্রশ্ন: আমি কিছু সংখ্যক বইপত্রে পড়েছি যে, রসায়ন শাস্ত্র হলো এক প্রকার জাদুবিদ্যা। সুতরাং এই কথাটা কি সঠিক? জেনে রাখা দরকার যে, বিষয়টি আমি ইবনল কায়্যিম রহ. –এর 'বুতলানুল কীমীয়ায়ে মিন আরবা'ঈনা ওয়াজহা' (بطلان الكيمياء من أربعين وجها) (চল্লিশ কারণে রসায়ন শাস্ত্রের অসারতা) –নামক বই থেকে শুনেছি। সুতরাং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকার পদার্থ ও উপাদান নিয়ে গবেষণার জন্য যে রাসায়নিক পরীক্ষা চলে, তা জাদু হওয়ার বিবেচনায় হারাম হবে কিনা? অথচ আমি নিজেও তার কিছু বিষয় অনুশীলন করেছি, কিন্তু আমি জিন্নেনের হস্তক্ষেপ অথবা জাদুকরের লেখা বা দাগের অস্তিত্ব ইত্যাদির মত জাদুর অস্তিত্ব বিদ্যমানের কোনো প্রকার চিহ্ন দেখতে পাই নি। সুতরাং এই বিষয়টি জানিয়ে আমাকে উপকৃত করবেন, আল্লাহও আপনাদেরকে উপকৃত করবেন।

الحمد لله, و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده ... و بعد :

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আর সালাত ও সালাম ঐ নবীর প্রতি, যাঁর পরে আর কোনো নবী নেই)।

অতঃপর.......

উত্তর: যেই রসায়ন শাস্ত্র ছাত্রগণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়ন করে, তা ঐ জাতীয় রসায়ন বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়, যা আলেমগণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, জাদু বলেছেন, জনগণকে তা থেকে সতর্ক করেছেন এবং তার অসারতার ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন, আর তারা বর্ণনা করেছেন যে, এটা এক ধরনের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা। উদাহরণস্বরূপ

(শরী'আতনিষিদ্ধ) রসায়নবিদ জাদুকর লোকেরা বলে যে, তারা লোহাকে স্বর্ণ বানিয়ে দেবে এবং তামাকে রৌপ্য বানিয়ে দেবে, আর তারা এসবের দ্বারা জনগণকে প্রতারিত করে এবং তাদের সম্পদকে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে। পক্ষান্তরে এ যুগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে যে রসায়ন শাস্ত্র পড়ানো হয়, তা হলো পদার্থকে তার বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লেষণ করা, যার সমন্বয়ে তা গঠিত অথবা উপাদানসমূহকে এমন পদার্থে রূপান্তরিত করা, যার থেকে তা গঠিত হয়, ঐ উপাদানসমূহ শিল্প ও ব্যবহারিক কার্যক্রমের মাধ্যমে গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যকে এমনভাবে ভিন্নমাত্রায় নিয়ে যায়, যার মাঝে প্রকৃত বিষয়টি বিদ্যমান থাকে; কিন্তু তথাকথিত রাসায়নিক বিদ্যার ব্যাপারটি তার বিপরীত। কারণ, তা হলো এক ধরনের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা। সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত রসায়ন শাস্ত্র ঐ জাদুর শ্রেণীভুক্ত নয়, যা হারাম করার ব্যাপারে ও যার থেকে সতর্ক করে আল-কুরআন ও সুন্নাহ'র মধ্যে নস তথা বক্তব্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে। আর আল্লাহ হলেন তাওফীক দাতা।

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .

(আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর)।

স্থায়ী পরিষদ, শিক্ষা-গবেষণা ও ফাতওয়া বিষয়ক

সভাপতি	সহ-সভাপতি
আবদুল আযীয ইবন বায	আবদুর রাজ্জাক 'আফীফ
সদস্য	সদস্য

আবদুল্লাহ ইবন গুদাইয়ান আবদুল্লাহ ইবন কু‘ঊদ

স্থায়ী পরিষদের ফাতাওয়া (فتاوى اللجنة الدائمة): **১/৪৪৭, ফাতওয়া নং-১১১৩৭**

শিক্ষার কারণে ইয়াহূদীবাদ ও খৃষ্টবাদের সমালোচনার করা

প্রশ্ন: আমেরিকাতে আমাদের শিক্ষার ফলে আমাদের ওপর খৃষ্ট ধর্ম ও ইয়াহূদী ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য পেশ করা হয়ে থাকে; আমাদের জন্য এই দু'টি ধর্মের ব্যাপারে কথা বলা জায়েয (বৈধ) হবে কি?

উত্তর: হ্যাঁ, তোমাদের জন্য তোমাদের জ্ঞান অনুযায়ী এই ব্যাপারে কথা বলা বৈধ হবে, তবে এই প্রসঙ্গে অথবা অন্য যে কোনো প্রসঙ্গে না জেনে কথা বলা বৈধ হবে না, আর জেনে রাখা দরকার যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলের শরী'আত ঐসব শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণের ওপর অবতীর্ণ করেছেন তাঁদের সমকালীন সময়ে স্থান-কাল পাত্র ভেদে তাঁদের উম্মতদের উপযুক্ততা অনুযায়ী, আর তা'আলা প্রতিটি শরী'আত প্রণয়ন ও নির্ধারণে প্রজ্ঞাময়, মহজ্ঞানী; যেমন তা'আলা বলেন,

﴿ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ ٤٨ ﴾ [المائدة: ٤٨]

“তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমরা একটা করে শরী'আত ও স্পষ্টপথ নির্ধারণ করে দিয়েছি।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪৮] অতঃপর ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা তাদের শরী'আতকে বিকৃতি ও পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং তার মধ্যে তারা শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন অনেক বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, অতঃপর আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রিসালাতসহ জিন্ন ও মানুষসহ গোটা বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর জন্য সাধারণ শরী'আতের ব্যবস্থা করেছেন, আর এর মাধ্যমে তিনি তাওরাত ও ইঞ্জিলের শরী'আতকে মানসুখ বা রহিত করেছেন এবং গোটা বিশ্ববাসীর জন্য

আবশ্যক করে দিয়েছেন যে, তারা যেন ঐ শরী'আতের আশ্রয়ে বিচার-ফয়সালার কাজ পরিচালনা করে, যেই শরী'আত দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন এবং তারা যেন অন্য সকল শরী'আতকে বাদ দিয়ে এটাকেই একমাত্র শরী'আত হিসেবে গ্রহণ করে; যেমনটি তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে সুরা আল-মায়েদার মধ্যে বলেছেন:

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًاۚ ﴾ الآية [المائدة: ٤٨]

"আর আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি ইতোপূর্বেকার কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী ও সেগুলোর তদারককারীরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী আপনি তাদের বিচার নিষ্পত্তি করুন এবং যে সত্য আপনার নিকট এসেছে, তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমরা একটা করে শরী'আত ও স্পষ্টপথ নির্ধারণ করে দিয়েছি।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪৮]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ ﴾ [النساء: ٦٥]

"কিন্তু না, আপনার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার ওপর অর্পণ না

করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ۝٥٠﴾ [المائدة: ٥٠]

“তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধি-বিধান কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৫০]

আর এই প্রসঙ্গে আরও অনেক আয়াত রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি উপকার হাসিল ও আমল করার উদ্দেশ্যে আল-কুরআনুল কারীমকে নিয়ে চিন্তাগবেষণা করবে এবং তাকে বেশি বেশি তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেবেন। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي لِلَّتِي هِيَ أَقۡوَمُ ﴾ الآية [الاسراء: ٩]

“নিশ্চয়ই এই কুরআন হিদায়াত করে সেই পথের দিকে, যা সুদৃঢ়।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৯]

শাইখ ইবন বায

ফাতাওয়ায়ে ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ৪/২৮০

বহির্বিশ্বে পারিবারিক পরিবেশে প্রবাসী ছাত্রদের বসবাস

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি শিক্ষার জন্য বহির্বিশ্বে গমন করবে, সেই ব্যক্তির জন্য অধিকতর ভাষাগত সুবিধা হাসিলের উদ্দেশ্যে ঐ দেশের জনগণের সাথে পারিবারিক পরিবেশে বসবাস করার বিধান কী?

উত্তর: পারিবারিক পরিবেশে বসবাস করা বৈধ নয়, যখন এর মধ্যে ছাত্রের জন্য কাফির সম্প্রদায় ও তাদের নারীদের চরিত্রের দ্বারা ফিতনা বা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা থাকে; বরং ফিতনার উপায়-উপকরণ থেকে দূরবর্তী স্থানেই ছাত্রের বসবাসের ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক, আর এই বিধানটি সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য হবে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কাফিরদের দেশে ছাত্রদের সফর বৈধতার পক্ষে মতামতের ওপর ভিত্তি করে। আর সঠিক কথা হলো, শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কাফিরদের দেশে সফর করা বৈধ নয়; তবে চূড়ান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে শর্তসাপেক্ষে ঐসব দেশে সফর করা বৈধ হবে, এই ক্ষেত্রে ছাত্রকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হতে হবে এবং ফিতনার উপায়-উপকরণ থেকে দূরে অবস্থান করতে হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لا يقبل الله عز و جل من مشرك بعد ما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين».

“আল্লাহ তা‘আলা ইসলাম গ্রহণ করার পরেও কোনো মুশরিকের আমল কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে মুশরিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

মুসলিমদের সাথে অবস্থান করবে।”[27] আবার ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী রহ. বিশুদ্ধ সনদে জারীর ইবন আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ». (أخرجه أبو داود والترمذي و النسائي) .

“আমি এমন প্রত্যেক মুসলিমের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত, যে মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে।” আর এই অর্থে বহু সংখ্যক আল-কুরআনের আয়াত ও হাদীস রয়েছে। সুতরাং মুসলিমগণের ওপর আবশ্যকীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো জরুরি মুহূর্ত ছাড়া মুশরিকদের দেশে গমন করার ব্যাপারে সাবধান ও সতর্ক করা। তবে যখন কোনো মুসাফির (পর্যটক) জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হয় এবং আল্লাহর দিকে জনগণকে দাওয়াত দানের ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে এটা হবে স্বতন্ত্র ব্যাপার, আর এর মধ্যে মহান কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কেননা, সে মুশরিকদেরকে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে ডাকবে এবং তাদেরকে আল্লাহর শরী‘আত শিক্ষা দেবে। সুতরাং সে হচ্ছে সৎকর্মশীল ব্যক্তি এবং তার নিকট যে জ্ঞান ও বুদ্ধি রয়েছে, তা দিয়ে সে বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকবে, আর সকল সাহায্য ও আশ্রয়ের স্থান হলেন আল্লাহ তা‘আলা।

শাইখ ইবন বায

ফাতাওয়া ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية): ১/১১৭

---

[27] ইমাম নাসাঈ তাঁর ‘আস-সুনান’ গ্রন্থে হাদীসখানা বিশুদ্ধ সনদে সংকলন করেছেন এবং নাসীর উদ্দিন আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন

গ্রন্থপঞ্জি

১. সুনানু আবি দাঊদ (سنن أبي داود), ইমাম হাফেয আবূ দাঊদ সুলাইমান ইবনল আশ‘আস আস্-সিজিসতানী আল-আযদী (২০২-২৭৫ হি.), প্রকাশ ও সরবরাহ: মুহাম্মাদ আলী আস-সায়্যিদ, হিমস, প্রথম মুদ্রণ, ১৩৮৮ হি./১৯৬৯ খ্রি.।

২. সহীহুল জামে‘ আস-সাগীর ওয়া যিয়দাতুহু (صحيح الجامع الصغير وزيادته), বিশ্লেষণ: নাসীর উদ্দীন আলবানী, প্রকাশক: আল-মাকতাবুল ইসলামী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি., বৈরূত।

৩. ফাতওয়া (فتاوى), শাইখ মুহাম্মাদ আস-সালেহ আল-‘উসাইমীন, প্রকাশক: মুআসসাসাতুদ দা‘ওয়া আল-ইসলামীয়া আস-সাহফীয়া, রিয়াদ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১৫ হি.।

৪. ফাতওয়া (الفتاوى), শাইখ আবদুল আযীয ইবন বায, প্রকাশক: মুআসসাসাতুদ দা‘ওয়া আল-ইসলামীয়া আস-সাহফীয়া, রিয়াদ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৪ হি. ১৪১৫ হি.।

৫. ফাতওয়া (الفتاوى), শাইখ সালেহ ইবন ফাওযান আল-ফাওযান, প্রকাশক: মুআসসাসাতুদ দা‘ওয়া আল-ইসলামীয়া আস-সাহফীয়া, রিয়াদ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১৫ হি.।

৬. আল-ফাতওয়া আল-ইজতিমা‘য়ীয়াহ (الفتاوى الاجتماعية), [সামাজিক ফাতওয়াসমূহ], শাইখ আবদুল আযীয ইবন বায এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আস-সালেহ আল-‘উসাইমীন, প্রকাশক: মুআসসাসাতুদ দা‘ওয়া

আল-ইসলামীয়া আস-সাহফীয়া, রিয়াদ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৪ হি. ১৪১৫ হি.।

৭. ফাতাওয়া ইসলামীয়া (فتاوى إسلامية), সম্মানিত আলেমবৃন্দ: শাইখ আবদুল আযীয ইবন বায, শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আস-সালেহ আল-‘উসাইমীন, শাইখ আবদুল্লাহ ইবন আবদির রহমান আল-জিবরীন, যারা স্থায়ী ফাতওয়া বোর্ড ও আল-ফিকহ একাডেমি পাঠ্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত; সংকলন ও বিন্যাস: মুহাম্মাদ ইবন আবদিল আযীয আল-মুসনাদ, প্রকাশক: দারুল ওয়াতন, রিয়াদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.।

৮. ফাতওয়া আকিদা (فتاوى العقيدة), [আকিদা বিষয়ক ফাতওয়াসমূহ], শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আস-সালেহ আল-‘উসাইমীন, প্রকাশক: মাতাবাতুস সুন্নাহ, আদ-দারুস সালফীয়াহ লিনাসরিল ইলম, কায়রো, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি.।

৯. ফাতওয়া আল-লাজনাতুদ দায়েমা লিল বুহুসিল ‘ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء), [শিক্ষা-গবেষণা ও ফাতওয়া বিষয়ক স্থায়ী পরিষদের ফাতওয়াসমূহ], সংকলন ও বিন্যাস: শাইখ আহমদ ইবন আবদুর রাজ্জাক, শিক্ষা-গবেষণা, ফাতওয়া, দা‘ওয়াত ও পরামর্শ দফতরের সাধারণ নেতৃত্বে মুদ্রণ ও প্রকাশ, রিয়াদ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১১ হি.।

১০. ফাতওয়া লিল মুদাররেসীন ওয়াত তুল্লাব (فتاوى للمدرسين والطلاب), [শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য ফাতওয়া], শাইখ আবদুল আযীয ইবন বায, শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আস-সালেহ আল-‘উসাইমীন এবং শিক্ষা-গবেষণা

ও ফাতওয়া বিষয়ক স্থায়ী পরিষদ, সম্পাদনায়: দারু ইবনে খুযাইমা, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

১১. ফাতাওয়া আল-মারআত (فتاوى المرأة) (নারী বিষয়ক ফাতওয়াসমষ্টি), তার উত্তর দিয়েছেন শাইখ আবদুল আযীয ইবন বায, শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আস-সালেহ আল-‘উসাইমীন, শাইখ আবদুল্লাহ ইবন আবদির রহমান আল-জিবরীন ও স্থায়ী ফাতওয়া বোর্ড, সংকলন ও বিন্যাস: মুহাম্মাদ ইবন আবদিল আযীয আল-মুসনাদ, প্রকাশক: মাকতাবাতু দার আস-সালাম, রিয়াদ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১৪ হি.।

১২. ফাতাওয়া আল-মারআতিল মুসলিমা (فتاوى المرأة المسلمة) [মুসলিম নারী বিষয়ক ফাতাওয়াসমষ্টি], সম্মানিত আলেমবৃন্দ: মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আলে শাইখ, শাইখ আবদুর রহমান আস-সা‘দী, আবদুল্লাহ ইবন হুমাইদ, ইবন বায, ইবন উসাইমীন, ইবন জিবরীন, ইবন ফাওযান; তার তত্ত্বাবধান করেছেন আবূ মুহাম্মাদ আশরাফ ইবন আবদিল মাকসুদ, প্রকাশক: মাকতবাতু দারি তিবরীয়া, রিয়াদ, মাকতবাতু আদওয়ায়িস সালফ (مكتبة أضواء السلف), দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

১৩. ফাতাওয়া মানারুল ইসলাম (فتاوى منار الإسلام), শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আস-সালেহ আল-‘উসাইমীন; সম্পাদনা, বিন্যাস, পরিমার্জন ও সূচীপত্র তৈরিকরণ: অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমদ আত-তাইয়্যার, প্রকাশক: দারুল ওয়াতন, রিয়াদ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.।

১৪. ফাতওয়া ওয়া রাসায়েল (فتاوى و رسائل), শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন আবদিল লতীফ আলে শাইখ, সংকলন, বিন্যাস ও বিশ্লেষণ: আবদুর রহমান ইবন কাসেম, প্রথম মুদ্রণ, সরকারী প্রকাশনা (مطبعة الحكومة), মাক্কাতুল মুকাররামা, ১৩৯৯ হি. মাকতাবু খিদমাতুত তালিবিল জামে'য়ী (مكتب خدمات الطالب الجامعي)।

১৫. ফাওয়ায়েদ ওয়া ফাতওয়া তুহিম্মুল মারআতাল মুসলিমা (فوائد فتاوى تهم المرأة المسلمة), শাইখ আল্লামা আবদুল্লাহ ইবন আবদির রহমান আল-জিবরীন, সংকলন ও বিন্যাস: রাশেদ ইবন 'উসমান ইবন আহমদ আয-যাহরানী, প্রকাশক: দারুস সামে'ঈ, রিয়াদ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

১৬. আল-মুন্তাকা মিন ফাতওয়া (المنتقى من فتاوى), শাইখ সালেহ ইবন ফাওযান ইবন আবদিল্লাহ আল-ফাওযান, প্রথম খণ্ড, সংকলন ও বিন্যাস: আদেল ইবন আলী আল-ফারীদান, প্রকাশক: দারুল ওয়াতন, রিয়াদ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১১ হি.।

১৭. আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আসার (النهاية في غريب الحديث و الأثر), ইমাম মাজদুদ্দীন আবি সা'আদাত আল-মুবারক ইবন আল-জাযারী ইবন আল-আসীর (৫৪৪-৬০৬ হি.), বিশ্লেষণ: তাহের আহমদ আল-যাবী ও মাহমুদ মুহাম্মাদ আত-তানাহী, প্রকাশক: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরবী, বৈরূত, লেবানন, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া।

আলোচ্য গ্রন্থে শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম, ইবন বায, ইবন উসাইমীন, ইবন জাবরীন, ইবন ফাওযান এবং স্থায়ী পরিষদ প্রভৃতি সম্মানিত বিশেষজ্ঞ আলেমদের ফাতাওয়া থেকে সংকলিত কিছু ফাতওয়া একত্রিত করা হয়েছে। যার দ্বারা প্রাথমিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীরাই উদ্দিষ্ট।